রুদ্ধকারার দিনগুলি

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

সিগ্‌নেট প্রেস
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৩

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রাকর

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রভু প্রেস

৩০ কর্নওআলিস ষ্ট্রীট

আর্টপ্লেট ব্লক ও মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৫০ পটলডাঙা ষ্ট্রীট

দাম তিন টাকা

জি. আর. ও.-কে

বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

"সসঙ্কোচে একটি দিন গেল চলে।
যেমন গতকাল তেমনি আজ,
সময়ের পারাবারে ছিটকে পড়া চঞ্চল শূন্য একটি বিন্দু।
উষার পাণ্ডুর পথে
রাত্রি যখন তার গুটিয়ে নেওয়া অঞ্চল থেকে
হারানো ছায়াটি ছড়িয়ে দেয়
আলোকের শীতল চুম্বনে কোনো মাধুর্য থাকে না;
আগামীকালের মুখ ঠিক সেই গতকালেরই মতো।"

*

আমার শেষ কারাবাসের সব কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখার কোনো চেষ্টা এই ছোট রোজনামচায় নেই। নিয়মিত ভাবে এইটি লেখা হয়নি, এর বিশেষ কোনো মূল্যও নেই। তবে ১৯৪২ এর আগস্টের পর থেকে সমস্ত সময়টার ওপর একটা অন্ধকার যবনিকা পড়েছিল, তাছাড়া অনেকের জেলখানার জীবন যে কি রকম সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, তাই মনে হয় যুক্ত প্রদেশের অপেক্ষাকৃত সুপরিচালিত একটি জেলখানার সাধারণ অবস্থা যে কি তা বুঝতে এই বইটি সাহায্য করতেও পারে।

আমার ও আমার সঙ্গে এক ব্যারাকে যারা ছিল, তাদের প্রতি জেলখানার আদর্শ অনুযায়ী বেশ একটু ভালো ব্যবহারই করা হয়েছিল বলা যায়। তাই বলে কেউ যেন না মনে করেন সকলের প্রতি এইরকম

ব্যবহারই করা হয়েছিল। সেই দুঃখের দিনের সব সত্য প্রকাশ পেলে অনেক নিদারুণ কাহিনী হয়তো জানা যাবে। কিন্তু সেদিনের এখনো অনেক দেরি। সুস্পষ্ট কারণে এই রোজনামচার কয়েকটি পাতা ও কোনো কোনো ঘটনা বাদ দিতে হয়েছে। জেলখানার প্রাচীরের অন্তরালে যা ঘটে, তা জানতে যাঁরা উৎসুক তাঁদের কাছে এই বইখানি আমি নিবেদন করছি।

— বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

রুদ্ধকারার দিনগুলি

১২ই আগষ্ট ১৯৪২

চমকে জেগে উঠে আমি আলোটা জ্বালালাম। বিন্দা আমার বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে, বললে, বাড়িতে পুলিশ এসেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। রাত তখন দুটো। আগের ২৪ ঘণ্টার ঘটনা-গুলো আমার মনে এলোমেলো ভাবে জট পাকিয়ে আছে। ছাত্রদের মিছিলের উপর যে গুলি চালানো হয়েছিল তার শব্দ এখনো আমার কানে বাজছে; যাদের খুঁজে বার করে আমি হাসপাতালে পাঠিয়েছি, সেই সব ছেলেদের মুখগুলো এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। শরীরে ও মনে আমার অসীম ক্লান্তি, বেশ একটু আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

মেয়েরা বারান্দায় ঘুমোচ্ছে, তাদের আর জাগাতে

চাই না। লেখা ও তারা সমস্ত দিনের এই সব ঘটনার পর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। তারা যা দেখেছে তাদের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবার নয়। তাই কেমন বিহ্বল বিষণ্ণ হয়ে গেছে।

বাইরের বারান্দায় গেলাম। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট ও জন ছয়েক সশস্ত্র পুলিশ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আলোটা জ্বেলে দিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখলাম বাড়ির সমস্ত জায়গা, শাদা পোশাকের পুলিশে ভরে গেছে। তাদের কেউ কেউ বারান্দা পর্যন্ত উঠে এসেছে। বিরক্ত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলবার আগেই, আমি একটু রূঢ় ভাবেই তাদের বাগানে নেমে যেতে বললাম। ম্যাজিস্ট্রেট বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছেন বোঝা গেল; বললেন, আমায় গ্রেপ্তার করবার একটা পরোয়ানা এনেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এই নিশুতি রাত্রে একজন নিরস্ত্র মহিলাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য এতগুলি সশস্ত্র লোকের কি প্রয়োজন ছিল? শুনলাম খানাতল্লাসীও

হবে। বললাম, তবে তাই হোক, ততক্ষণ আমি জেলে যাবার জন্য তৈরি হয়েনি।

আমায় ধরা হবে আমি ভাবিনি, ব্যাপারটা তাই আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। মেয়েদের কাছে থাকবার কেউ নেই, ভালো মতো ব্যবস্থা করবার কোনো উপায়ও নেই। ইন্দিরা কয়েক ঘণ্টা আগে বম্বে থেকে এসেছে। তার কাছে বিদায় নেবার জন্যে আমি ওপরে গেলাম। চুমু খেয়ে তাড়াতাড়ি ইন্দিরাকে দু-একটা ব্যবস্থার কথা বলে, মেয়েদের জাগিয়ে আমি খবরটা দিলাম। মনের জোর তাদের বরাবরই বেশি, তারা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝল। অকারণ কোনো প্রশ্ন বা হৈচৈ কিছুই করল না। তিনজনে মিলে আমার জিনিসপত্র গুছোতে সাহায্য করলে। সঙ্গে নেবার জন্যে লেখা কয়েকটা বইও এনে দিল। রিতা ঘুমে ঢুলু ঢুলু বড় বড় ডাগর দুটি চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে আমার সাহস যেন উবে যেতে লাগল। কতটুকুনই বা মেয়ে, আর কত বিশাল এই পৃথিবী

কে তাকে দেখবে। আমার মনের কথা যেন বুঝেই সে আমার দিকে চেয়ে হাসল। বললে, "কী চমৎকার লাগে বলতো মা, এই আজকালকার দিনগুলো! ইচ্ছে হয়, আমিও যদি জেলে যেতে পারতাম!" হঠাৎ আমার মনে হল অকারণে দুর্ভাবনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মনটা আমার হালকা হয়ে গেল। নিচু হয়ে আমি তাকে চুমু খেলাম। তারা বললে, "বাইরে গিয়ে তোমার কাছে বিদায় নেব মা। পুলিশের লোক দেখুক এরকম ছাড়াছাড়ির সময় আমরা কি করি।" আমায় বিদায় দিতে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এল। লেখা আমায় জড়িয়ে ধরে আদর করে বললে, "লক্ষ্মী মা-মনি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাচ্চাদের আমি দেখা শোনা করব।" তারা বললে, "তাহলে এস মা-মনি। আমরা নিশান উড়িয়েই রাখব।" তার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে, ঘাড় সে উঁচু করে রেখেছে। রিতা মিনিট খানেক আমাকে জড়িয়ে রইল, তার পর বেশ সহজ সতেজ গলায় বললে, "সাবধানে থেকো মা-মনি।

তুমি যখন জেলের ভেতরে থাকবে, তখন আমরা বাইরে বৃটিশের সঙ্গে লড়াই চালাব।”

ইতিমধ্যে চাকর-বাকরদের কয়েকজন এসে গেছে। তাদের কাছেও আমি বিদায় নিলাম। তাদের মনের জোর আমার বাচ্চাদের মতো অত বেশি নয়। দু-একজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বাগানের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে আমি গেট পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, গেটের দরজা এত রাত্রে যেমন থাকা উচিত তেমনি বন্ধই আছে। পুলিশ তাহলে কোথা দিয়ে ঢুকল! বোধহয় পাশের ছোট দরজা দিয়ে। সেই পথেই আমরা বেরিয়ে গেলাম।

বাইরের রাস্তায় তিনটে কি চারটে পুলিশের লরি দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে তাদের ঠিক সংখ্যা ঠাওর করতে পারলাম না। আরও অনেক সশস্ত্র পুলিশ অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আমায় বলা হল প্রথম লরিটায় উঠতে। ডি. এস. পি. নিজেই গাড়ি চালাতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ও

আরও দু'চারজন পিছনে এসে উঠবার পর গাড়ি ছেড়ে দিল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে সমস্ত শহর সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন হয়ে আছে। আসলে মার্শাল-ল'ই চলেছে, শুধু নামটা দেওয়া হয়নি। সান্ধ্য-আইন তো জারিই হয়ে গেছে। একটা অত্যন্ত কঠিন বিরোধের আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। নৈনি যাওয়ার পরিচিত রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেক চিন্তাই আমার মাথায় উদয় হল, আমার চোখের ওপর দিয়ে সিনেমার ছবির মতো, ১৯২১ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক যাত্রার ছবি ভেসে গেল। যমুনার পোলের ওপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত। সেখানে পৌঁছতেই সান্ত্রীরা আমাদের বাধা দিলে, "বন্ধু" ও "পুলিশ-কার" শব্দগুলি চেঁচিয়ে বলবার পরেও সতর্ক প্রহরীরা আমাদের পথ ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে যেন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। বৃটিশদের সেবা যারা করে, কী অসীম না তাদের প্রভুভক্তি!

নৈনিতে গিয়ে পৌঁছবার পর আমায় জানান হল

যে, জেলের কর্তারা আমার আসার খবর পায়নি। বোঝাই গেল যে পুলিশকে অনেক বেশি রাত্রে গ্রেপ্তার করবার আদেশ জানান হয়েছে; জেলের লোকেরা তাই এরই মধ্যে আমার আশাই করেনি। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর, মেয়েদের জেলের দরজা খুলল, এবং জেলের মেট্রনদের যেমন দস্তুর তেমনি ভাবে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এখানকার মেট্রন ছুটে এল।

সেই পুরানো ব্যারাকে আমায় নিয়ে যাওয়া হল। রাত তখন পৌনে চারটে। মাটির ওপর আমি আমার বিছানা পাতলাম। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে চাবি পড়ল, আমার কারাজীবনের নতুন পালা শুরু হল। আমার মাথার অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছিল, রগদুটো অনবরত দপদপ করার দরুন ঘুম আর কিছুতেই এল না। শুয়ে শুয়ে আমি গত দুদিনের কথা ভাবতে লাগলাম। লেখাকে নিয়েই আমার ভাবনা। শেষ পর্যন্ত সেও জেলে এসে উঠবে বলে আমার মনে হয়। আগের দিন রাত্রে শুতে যাবার সময় তার সঙ্গে

আলাপ করে, এখনকার ব্যাপারে তার মনের ভাব কি রকম হয়েছে আমি জানবার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম তার মন অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। বললে, "যা আমি দেখেছি মা, তা ভুলতে আমি সহজে পারব না। যে বিদ্বেষ আমার মনে জমে উঠছে, তা একেবারে নির্মূল করতে আরও অনেক বেশি দিন আমার লাগবে। সহজ জীবনের কথা আর আমরা ভাবতেই পারি না, ফিরে যাবার রাস্তা আর আমাদের নেই। পথ যেখানেই গিয়ে শেষ হোক, আমাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে।" লেখার কথাই ঠিক ; আমাদের শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই হবে।...অবশেষে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৩ই আগষ্ট ১৯৪২

প্রথম জেগে উঠেই আমার মেয়েদের কথা মনে পড়ল। তখন আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই লম্বরদারনী এসে ব্যারাক ঝাঁট দিতে না-চাওয়া পর্যন্ত আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম।

পুরানো পরিচিত মুখ খুব কমই দেখতে পাচ্ছি। যারা নতুন তারা এমন ভাবে আমার দিকে চায়, যেন আমি কোনো যাদুঘর থেকে এসেছি। জল নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনো ব্যবস্থা নেই—সত্যি কথা বলতে গেলে কিছুই নেই। একঘণ্টা উঠানে পায়চারি করবার পর, কয়েদীদের স্নানের কল থেকে একটু জল পেয়ে, তাইতে মুখ ধুলাম। সাতটা নাগাদ মেট্রন এসে জানালে যে দশটার আগে জেল থেকে খাবার-দাবারের কোনো বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হবে না, তাই সে তার বাড়ি থেকেই আমার জন্যে কিছু চা পাঠাচ্ছে। মেট্রনের কাছে এই চা নেবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাথাটা বড্ড দপদপ করছে, তাই ভাবলাম চা খেলে যদি একটু কমে। কিন্তু কমল না। দিনটা বড় বিশ্রী ভাবে কাটল।

দুপুরের দিকে কিছু কাঁচা খাবার-দাবার বরাদ্দ এল। কিন্তু কয়লা নেই সুতরাং রান্না করা অসম্ভব। পরে একজন কয়েদীর সাহায্যে আমি ডালপালা খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে রাঁধবার একবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হল, আগুন জ্বলতেই চায় না। বই পড়ে, আমি বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে এই রোজনামচা শুরু করলাম। এখন প্রায় ছ'টা বাজে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের তালা বন্ধ করা হবে। দেখতে পাচ্ছি যথারীতি সারবন্দী জমাদারনীদের আগে আগে মেট্রন আমাদের ঘরে তালা দিতে আসছে। আমার তৃতীয় কারাবাসের প্রথম দিন এই ভাবে শেষ হল।

তালা বন্ধ করবার আধঘণ্টা বাদে মেট্রন আবার ফিরে এসে জানাল যে, আমার ব্যারাক খোলা রাখবার হুকুম সে পেয়েছে। ইচ্ছা করলে আমি বাইরে শুতে পারি। এটুকু সুবিধে পেয়ে আমি খুশিই হলাম। যাবার আগে মেট্রন, রাত্রে আমি কি খাব খোঁজ করলে। খাবার মতো কিছুই আমার নেই শুনে সে তো স্তম্ভিত! আমায় যাহোক কিছু সে পাঠাতে চাইলে, কিন্তু আমি নিতে রাজী হলাম না। উঠানে খানিকক্ষণ আমি বেড়ালাম। সেখানে বেশ ঠাণ্ডা, আমার মাথাটা অনেক ভালো বোধ হল।

পায়চারি করতে করতে আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম যে, প্রায় দেড় বছর আমি এ-জায়গায় ছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন আগেকার কারাজীবন এখন পর্যন্ত চলছে। বাইরের উঠানে বিছানা পেতে আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ব ভাবলাম, কিন্তু নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে বইয়ে আমার মন বসল না। থেকে থেকে দেয়ালের ওপার থেকে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' প্রভৃতি চীৎকার আমার কানে আসছে। এরপর আমার যেন আর ততটা একলা নিজেকে মনে হল না, এক হিসেবে বলতে গেলে আরও খুশিই হলাম। আকাশে তারা ফুটেছে, কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আবার বই পড়ায় মন দিলাম। সাড়ে ন'টার সময় আলো নিবিয়ে দিতে হল, কারণ অগুন্তি পোকার উপদ্রবে প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। সারা গায়ে মাথায় সব জায়গায় পোকা গিজগিজ করছে।

রাত এগারটায় জেগে উঠে দেখি মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে; আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বিছানা

ভেতরে আনতে না-আনতেই আমি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গেলাম। তাই পোশাক বদলাতে হল। বৃষ্টির পর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল। রাতটা বেশ শান্তিতেই কাটল।

১৪ই আগষ্ট ১৯৪২

সকাল বেলা উঠে নিজেকে বেশ ঝরঝরে মনে হল। এখন দুনিয়ার সবাইকে আপ্যায়িত করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু সাড়ে আটটা পর্যন্ত যখন না এল কয়লা, না পেলাম চা, তখন মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে টের পেলাম। ক্ষিদে পাওয়াটাও বোধহয় তার একটা কারণ। মেট্রন এখনো পর্যন্ত আসেনি, তাই আমি সুপারিনটেনডেণ্টকে চিঠি লিখে জানালাম যে, জেলে আমাকে আনবার পর এ-পর্যন্ত আমায় কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। মেট্রন অনুগ্রহ করে তার বাড়ি থেকে চা না পাঠালে আমায় সম্পূর্ণ উপোস করে থাকতে হতো। একথাও উল্লেখ করে দিলাম যে রান্না করে খাবার মতো কাঁচা জিনিসের যদি জেলে

অভাব থাকে, তাহলে আমাকে অন্য কয়েদীদের যা দেওয়া হয়, সেই রান্না করা খাবারও দেওয়া যেতে পারে। এ-চিঠি পেয়েই মেট্রন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। আমার খাবার বরাদ্দ আসতে দেরি হওয়ার জন্যে অনেক করে মাপ চাইলে।

কিছুক্ষণ বাদে কিছু তরিতরকারি, চালডাল ও এক বাণ্ডিল জ্বালানি কাঠ এসে হাজির হল। তার আগে একজন কয়েদীর সাহায্যে বারান্দার এক কোণে আমি একটা উনুন তৈরি করে ফেলেছি। বারান্দার ওই কোণটাই আমার রান্নাঘর। কিছু তরিতরকারি কেটেকুটে পরিষ্কার করে আমি সাদাসিধে গোছের কিছু রান্না করে নিলাম। সত্যি ক্ষিদে পেয়েছিল বলে, সেই রান্নাই চমৎকার লাগল।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪২

খাবার সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা একটু বাড়াবাড়িই করে থাকি। জেলে বিশেষ করে একথা বোঝা যায়। পরিবেশটি যদি মধুর হয়, ঠিক মতো সঙ্গী পাওয়া

যায় আর তার ওপর রান্না ও পরিবেশন যদি ভালো হয়, তাহলে খাওয়াটা সত্যিই উপভোগ করা যায় বটে। কিন্তু অত্যন্ত স্থূল আদিম পদ্ধতিতে রাঁধতে গিয়ে আগুন-তাতে যদি অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়, আর তার ওপর রান্নার জিনিসপত্র যদি ছাতাপড়া হয়, তাহলে খাওয়ায় কোনো সুখ থাকে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। আমি ঠিক করেছি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শুধু চা আর রুটি খেয়ে থাকব।

জেলের চা যে কি চীজ না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। চা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিচিত্র। ম্যাডাম চিয়াং আমায় যে অপরূপ সুগন্ধি নানারকম মধুর চা পাঠান তা থেকে শুরু করে ইলেকশান-অভিযানের সরবৎ গোছের যে-পানীয় গলাধঃকরণ করতে হয়, সেই সবরকম চা-ই আমি খেয়েছি। কিন্তু জেলের চায়ের তুলনা কোনো কিছুর সঙ্গেই হয় না। যে-সব হতভাগ্যদের জেলে আসতে হয়, তাদের জন্যেই বিশেষ করে এই সাংঘাতিক পাতার চাষ করা হয় বলে আমার দৃঢ় ধারণা। নিজের কোনো চা না

থাকায় একবার এই পাঁচন খেয়ে আমি প্রায় গেছলাম আর কি! জেলের সমস্ত কর্তৃপক্ষকে এক হপ্তা যদি জেলের খাবার খাইয়ে রাখতে পারতাম, কি আনন্দই না আমার হতো বলতে পারি না। পুষ্টিকর ও সুসঙ্গত খাদ্য নিয়ে এত কথা তাহলে আর আমাদের শুনতে হতো না। আমি ভাবি যে পরের জন্যে সব দিকের সামঞ্জস্য বজায় রেখে খাবারের ব্যবস্থা আমরা বেশ করতে পারি, শুধু নিজের বেলায়ই সামঞ্জস্যের কথা আর মনে থাকে না, সব চেয়ে সরস মুখরোচক জিনিসগুলিই তখন বেছে নিই।

আজ আমি একটা চমৎকার বই পড়ব—পৃথিবীর অসাধারণ সমস্ত চিঠির একটি সঙ্কলন—বইটি ইন্দু আমায় ধার দিয়েছে। সন্ধ্যাটা খুব মজায় কাটবে আশা করছি। এই সময়টায় কোনো কিছু নিয়ে আমি মগ্ন হয়ে থাকতে চাই। কারণ এই সময়টাতেই আমার যত সব কথা মনে পড়ে, বাড়ির জন্যে একটু মন কেমন করে। এবারে কতদিন জেলে কাটাতে হবে

কে জানে। এখন থেকেই এ-সব কাটিয়ে উঠে মন স্থির করে ফেলাই ভালো।

১৬ই আগষ্ট ১৯৪২

আজ সকালে উঠে প্রথম খবর পেলাম এই যে কাল শহরে দুবার গুলি ছোঁড়া হয়েছে। খবর যে-সূত্রে পেয়েছি তা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি না বটে, তবু মনটা অস্থির হয়ে আছে। বাইরে আর সবাই যখন প্রতিদিন বিপন্ন হচ্ছে তখন এখানে বন্দী হয়ে থাকা সত্যই নিদারুণ।

মেট্রন এসে আমার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিলে। তার এখন একটু গল্প-গুজবের শখ হয়েছে মনে হয়। কিছুই বলবার নেই—তাই আমি চুপ করে বসে রইলাম আর সে আমায় তার নিজের জীবনের কথা বলে গেল। কাহিনীর মাঝে মাঝে, যে-সব সুপারিন্-টেনডেণ্টের কাছে সে কাজ করেছে, আর জেলখানার যে-সব ইনস্‌পেক্‌টর-জেনারেলদের দেখবার, ও যাদের সঙ্গে কথা বলবার তার সৌভাগ্য হয়েছে,

তাদের সম্বন্ধে মন্তব্যের ফোড়নও চলছিল। জেলের শাসন ও পরিচালনা সম্বন্ধে নানা মেট্রনের নানান্ মত মিলিয়ে দেখতে বেশ মজা লাগে। একদিন হয়তো আমি একটা বই লিখব, যার নাম হবে, "যে সব জেল ও মেট্রন আমার জানা।" সেই বই পড়তে নিশ্চয় খুব ভালো লাগবে। এবার জেলে যদি আমায় বেশি দিন কাটাতে হয়, তাহলে জেলখানার রাজনীতির সঙ্গে আমার বেশ ভালোরকমই পরিচয় হয়ে যাবে—অবশ্য এখনই আমার সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। মানুষের মনের মারপ্যাঁচ যে বুঝতে চেষ্টা করে, তার কাছে সেই রাজনীতি খুব জটিল অবশ্য নয়।

কাল রাত্রে এক ঘণ্টা সেই চিঠির বইখানা পড়েছি। কয়েকটি চিঠি সত্যিই অপরূপ। 'ভলটেয়ার' বলেছেন "চিঠি পড়তে সব সময়ই ভালো লাগে, বিশেষ করে— যদি পরের হয়।" আর একজন কে সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, "যতদিন দুনিয়ায় ডাকপিয়ন আছে, তত-দিন জীবন সরস থাকবেই।" কথাগুলো যে সত্যি তা

সবাই বোধ হয় জীবনের কোনো না কোনো সময় বুঝতে পারে। অধীর আগ্রহে বাঞ্ছিত চিঠির জন্যে আমাদের অনেককেই বোধ হয় একদিন-না-একদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে—হয়তো সে-চিঠিতে অনেক দূর থেকে আমাদের কোনো ছেলেমেয়ের খবর আসবার কথা, হয়তো সে-চিঠি বিদায় নিয়ে যাওয়া কোনো বন্ধুর, হয়তো বিশেষ দরকারি টাকা পয়সা সংক্রান্ত চিঠি কিম্বা হয়তো শুধুই ভালোবাসার পত্র—মধুর অর্থহীন কথা গেঁথে গেঁথে সব প্রণয়ীই যে-চিঠি লেখে, আর একান্ত তারই মনে করে যে-চিঠির জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকার সময় প্রণয়িনী ভুলে যায় যে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সব প্রেমিক এই একই অনুভূতি একই ভাষায় প্রকাশ করে আসছে।

মেট্রন আজকে একজন কয়েদী-মেয়েকে আমার রান্না-বান্না, মাজাধোয়া ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুমতি দিয়েছে। তার নাম দুর্গা, জাতে সে কুমোর। তার ইতিহাসের কাগজপত্র থেকে জানলাম যে তার বয়স ছাব্বিশ, স্বামীকে খুন করার জন্যে জেল খাটছে।

ইতিমধ্যেই তার আট বছর এখানে কেটে গেছে। মেয়েটির রঙ খুব কালো, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা ভালো, স্বভাবটিও মিষ্টি। অন্য মেয়ে-কয়েদীদের মতোই সে শুধু একটা খাটো ইজের আর তার ওপর একটা জামা পরে। জামাটির বিশেষ কোনো নাম নেই। একটা ঘাগরা আর ব্লাউস জেলের নিয়মিত পোশাক কিন্তু গ্রীষ্মকালের পক্ষে তা অত্যন্ত ভারী আর গরম বলে, তদারকের দিন ছাড়া কেউ তা পরে না। দুর্গার শরীরের গড়ন সুন্দর, তার খাটো পোশাকে সে-সৌন্দর্য ভালো ভাবেই চোখে পড়ে। তার সঙ্গে আমার ভালোই বনবে মনে হচ্ছে।

আজ খুব জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন তাই অনেকটা ঠাণ্ডা। এখনো আকাশ মেঘে ঢাকা, তাই মনে হয় রাত্রে আরো বৃষ্টি হবে। ব্যারাকের ছাদ এমন শতচ্ছিদ্রে যে কোনোখানে বিছানা রেখে নিস্তার নেই, সব জায়গাতেই জল চুইয়ে পড়ছে। কোনোরকমে একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি, বিছানায় সেখানে জল পড়বে না বটে কিন্তু পা বেশ ভিজে

যাবে। পোকার উপদ্রব বেড়েছে, আলো জ্বালিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এত সহজে হার মানতে আমি রাজী নই। এখন মোটে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, এরইমধ্যে আমি কিছুতেই শুতে যেতে পারিনা। তাই বই পড়ে সব জ্বালা ভুলব মনে করছি—'অ্যাবেলার্ড'কে লেখা 'হেলয়সে'র চমৎকার চিঠিগুলো আজ পড়ব। জেলের বাইরে যেমন ভেতরেও তেমনি সামাজিক-ভেদাভেদের সংস্কার বেশ প্রবল। কোনো মেয়েকে ফুসলে বার করবার অপরাধে যার কয়েদ হয়েছে তার স্থান সব চেয়ে নিচের ধাপে, তার ওপরে হল যারা টাকাকড়ি জাল করে জেলে এসেছে, এবং যারা খুনের দায়ে জেল খাটছে তারা হল সব চেয়ে ওপরের ধাপের। এরাই নেতৃস্থানীয়া এবং নিজেদের পদমর্যাদা সম্বন্ধে তাদের গর্ব প্রচুর। ঝগড়া হলে প্রায়ই কোনো না কোনো মেয়েকে বলতে শোনা যায়, "মুখ সামলে কথা বলবি, আমি চোর-ছ্যাঁচড় নই, দস্তুর মতো খুন করে জেলে এসেছি।" ১৯৩২ সালে আমি যখন প্রথমবার জেলে আসি তখন এই

শ্রেণীর মেয়েদের আমি একটু ভয় করতাম। কিন্তু শিগ্‌গিরই বুঝতে পারলাম যে হঠাৎ উত্তেজনার মুহূর্তে বা রাগের মাথায় আমরা যে কেউই এ-রকম সাংঘাতিক একটা কিছু হয়তো করে ফেলতে পারি—কিন্তু তাই বলে, যারা ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিদিন, চুরি, মেয়েদের ফুসলান প্রভৃতি অপরাধ করে, তাদের মতো নীচ, ঐ একটি অপরাধের দরুন কেউ হয়ে যায় না।

১৭ই আগষ্ট ১৯৪২

কাল রাত থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। আমার ব্যারাক ঠিক যেন একটা হ্রদের মতো দেখাচ্ছে। বিছানাটা তারই মধ্যে যেন একটা দ্বীপ। সেখানে আশ্রয় নিলে জলের হাত থেকে তবু কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। এই আবহাওয়ায় আমার কিন্তু ভালোই হয়েছে। আমার মেজাজের সঙ্গে তার মিল আছে। আমি তাই তা গ্রাহ্যই করিনি। মনে হয় আজ রোদ উঠলে আমার মনটা বুঝি আরও বেশি খারাপ হতো। দিনটা কোনো রকমে গড়িয়ে যাচ্ছে, কোনো কিছু

করার গরজ বোধ করিনি। দুর্গাকে আমার জন্যে যা হোক কিছু খাবার তৈরি করতে বলেছিলাম। তখন কি আর জানি! ভেবেছিলাম কাজটা তার পক্ষে সহজই হবে। কিন্তু সে যা তৈরি করে নিয়ে এল, দেখতে তা নোংরা পরিজের মতো, খেতে আরও খারাপ।

আগেকার মতো এখন কাঠ-কয়লা আমাদের দেওয়া হয় না। ভিজে কাঠে এমন ধোঁয়া বেরোয় যে রান্না করা দুঃসাধ্য। অতি নীরেস জিনিসপত্র আমাদের দেওয়া হয়, তাও ধুলো-বালি মেশান। ওজন বাড়াবার জন্যে ছোট ছোট পাথর কুচি ও দু-চারটে মাকড়সাও তার মধ্যে থাকে। চাল-ডাল, পরিষ্কার করবার পর দেখা যায়—তা পরিমাণে বেশ কমে গেছে। খাবার জিনিসে যে-সব ময়লা আমি পেয়েছি তা পরিদর্শনের দিন ডাক্তারকে দেখাবার জন্যে আমি জমিয়ে রাখছি। যে-ঘি আমি পাই, গাঢ় বাদামী তার রং, গন্ধটাও অদ্ভুত। আসলে ঘি এত সামান্য পাই যে ভালোমন্দ বিচারের প্রশ্নই আর ওঠে না।

খবর না পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। গুজব কিন্তু

অনেক রকম শোনা যায়। জেলটা একরকম কানা-কানি করারই জায়গা। চুপি চুপি এখানে যে-সব কথা বলা হয়, তা ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে অনবরত চার-দিকে ঘুরে বেড়ায়। সে-গুজব না শুনেও উপায় নেই। কিন্তু গুজবে তো আশ মেটে না, সত্যিকার আসল খবরই শোনবার জন্যে মন আকুল হয়ে থাকে—বিশেষ করে এ-রকম সময়। অকারণে ভেবে ভেবে মেজাজ খারাপ করছি দেখতে পাচ্ছি।

১৮ই আগষ্ট ১৯৪২

সোমবার প্যারেডের দিন। সকাল থেকে হৈ চৈ হুটোপাটি চলেছে—চেঁচামেচি, গালাগালি, দৌড়া-দৌড়ি এবং সব শেষে সুপারিনটেনডেণ্টের আগমন। সুখের বিষয় ব্যাপারটা খুব সংক্ষিপ্ত। সুপারিনটেন-ডেণ্টের সঙ্গে বাজে আলাপ করবার জন্যে আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না। তিনি আমাকে মাছি মারবার জন্যে ডগায় চামড়ার ফালি বাঁধা একটা বেত পাঠিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কাজে লেগেছে

কিনা। বললাম, মাছি বেশি মারতে পারি না-পারি সেটা দিয়ে গায়ের ঝাল অনেকটা মেটান যায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি সন্তুষ্ট?" আসলে বোধ হয় জানতে চেয়েছিলেন, আমি আরামে আছি কি না। আমি জবাব দিলাম, সন্তুষ্ট হলে কি জেলে আসতাম। পরিদর্শন এই ভাবেই শেষ।

সুপারিনটেনডেণ্টের মন্তব্য আমার ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। পরিতৃপ্তি, আরাম, সুখ, স্বাধীনতা, এ-সব কথা এখন কি অর্থহীন! বার্নার্ড শ'র সঙ্গে আমার সায় দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, 'কীর্তি, সৌন্দর্য, সত্য, জ্ঞান, ধর্ম ও স্থায়ী প্রেম, মানুষের এ-সব গৌরব শুধু কাগজের পাতাতেই আছে।' কিন্তু এ হল নিরাশা-বাদীর কথা—আমাদের মতো যারা স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে তাদের এ-রকম দৃষ্টিভঙ্গী গভীর হতাশার দিনেও সাজে না। এ-রকম মনোভাব যাতে না হয় সে-বিষয়ে আমায় সাবধান হতে হবে।

শেষ লাইনটা সবে লিখেছি এমন সময় বাইরের গেটের গোলমাল থেকে জানা গেল, আর একজন

পরিদর্শক এসেছেন। এবার এসেছেন কমিশনার। তিনি সোজা আমার ব্যারাকে এসে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বেশ আরামে আছি কিনা। সুস্পষ্ট উত্তরটা দিয়ে কোনো লাভ নেই, তিনিও তা বোধ হয় আশা করেননি। কোনো কথা না বলে তাই আমি শুধু একটু হাসলাম। তাড়াতাড়ি ব্যারাকের চারধার ঘুরে ফিরে একটু দেখে তিনি সরে পড়লেন।

আজ আমার জন্মদিন। বাচ্চারা আমায় অনেকগুলো বই পাঠিয়েছে। কিন্তু এই উপহারের আনন্দ বেশিক্ষণ ভোগ করা গেল না। সুপারিনটেনডেণ্ট আমায় জানালেন যে নতুন একপ্রস্থ নিয়মকানুন তাঁকে জেলে চালাতে বলা হয়েছে। সে-নিয়মকানুন আমাদের ওপরেও প্রয়োগ করা হবে। আমাদের এখন থেকে দু'নম্বর বন্দী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হবে। খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়া, চিঠি লেখা, বাড়ি থেকে জিনিস পাঠান বা কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ আমাদের দেওয়া হবেনা। জেলের পোশাক

আমাদের দেওয়া হবে, তালা বন্ধ থাকতে হবে। আমাদের দৈনিক বরাদ্দ বারোআনা কমিয়ে ন'আনা দেওয়া হবে।

আর কিছু নয়, শুধু চিঠিপত্র পাব না ও লিখতে পারব না, এইটুকুই আমার সব চেয়ে খারাপ লাগছে। সুপারিনটেনডেণ্ট আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে ছাড়া আপনার বাচ্চাদের কি করে চলবে?" বললাম, "তারা নিজেরাই নিজেদের সামলাতে পারে।" আমার জবাবে তিনি একটু অবাক হলেও সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তারা খুব সাহসী ও শক্ত বটে।"

পনেরো তারিখ মহাদেব দেশাই জেলে হার্টফেল করে মারা গেছেন শুনে অত্যন্ত আঘাত ও দুঃখ পেলাম। আমার মনে তাঁর নানান ছবি ভাসছে। সত্যি একজন ভালো লোক ছিলেন, ভগবান যে দু'চার জন ভালো লোক গড়ে পাঠান, তাঁদেরই একজন। তাঁকে হারিয়ে আমাদের বড় ক্ষতি হল। কে জানে দুর্গা আর তার ছেলেটি এখন কোথায়! বাপু এখন

জেলে সুতরাং তাদের আর কোনো আশ্রয় নেই। দুর্গাকে দুটো সান্ত্বনার কথা যদি জানাতে পারতাম! মহাদেব ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে আছে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে তাঁর সঙ্গে জড়িত কত ঘটনাই না মনে পড়ছিল! এই তো সেদিন তিনি আনন্দ-ভবনে এসে 'মডার্ণ রিভিয়ু'-এর একটা প্রবন্ধ আমায় পড়তে অনুরোধ করলেন, প্রবন্ধটি তাঁর এক 'প্রিয় বন্ধু'র লেখা—লেখক বয়সে নবীন ও তাঁর মতে অত্যন্ত অমায়িক ও প্রতিভাবান। সেটা ১৯২০ সাল। প্রবন্ধটির নাম 'গুরুর শ্রীচরণে'—লেখক রঞ্জিত পণ্ডিত। আজ বাইশ বছর ধরে আমি অত্যন্ত 'প্রতিভাবান ও অমায়িক' এই মানুষটির সঙ্গে বিবাহিত। রঞ্জিত ও মহাদেব একসঙ্গে কলেজে পড়েন ও একই বছরে বি. এ. পাশ করেন। পরস্পরকে চিঠিপত্র তাঁরা খুব কম লিখলেও দুজনের মধ্যে প্রাণের টান খুব গভীর। মহাদেব আর নেই শুনে রঞ্জিত অত্যন্ত দুঃখ পাবেন।

১৯শে আগস্ট ১৯৪২

জেলখানা সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, সেখানে মানুষকে বড় বেশি নিঃসঙ্গ থাকতে হয়। মনের মতো সঙ্গী না পাওয়ার যে নিঃসঙ্গতা, তা সেখানে বোধ করতে হয় বটে, কিন্তু একলা থাকতে হয় না। এই এক হপ্তা এখানে আসা অবধি নির্জনতার জন্যে কি আকুল যে হয়ে আছি বলতে পারি না। আর কোথাও এরকম আকুলতা অনুভব করিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এক মুহূর্ত যদি একলা থাকার জো আছে! সবাই আমার দরদী, সবাই আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্যে ব্যাকুল, যাতে আমি তাদের এখান থেকে বার করবার ব্যবস্থা করতে পারি। গোলমাল, পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ, ঝগড়া, মারামারি—তার ওপর গালাগালির আদান-প্রদান তো অহরহ চলছেই। এতে সত্যিই মন ক্লান্ত হয়ে যায়। রাত্রেও শব্দের বিরাম নেই। বাইরে যে-রকম শোনা যায়, সে-রকম আচমকা ছোটখাট শব্দ নয়—এক ঘেয়ে কর্কশ এমন

সব আওয়াজ—বার বার শুনে শুনে যাতে মেজাজ বিগড়ে যায়। আর্নষ্ট টলার তাঁর একটা চিঠিতে জেলখানা সম্বন্ধে এই কথাই লিখেছেন, দিনের পর দিন বেসুরো শব্দের অসংখ্য শৃঙ্খলে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। জেল যাঁরা খেটেছেন শুধু তাঁরাই এ-কথার সত্যকার অর্থ বুঝতে পারবেন। অবশ্য আব্রুর অভাব ও এই সব গোলমাল, প্রথম দিকেই সব চেয়ে খারাপ লাগে। পরে কিছুদিন বাদে মনের জোরে সব গোলমাল ঠেকিয়ে রাখা যায়। ব্যারাক ভর্ত্তি মেয়ের কথাবার্ত্তা ও ঝগড়ার গোলমালের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেন একলা আছি এইভাবে এক মনে বই পড়ে যেতে আমি তো পেরেছি। কিন্তু এতে সময় লাগে, আর মনের কতকটা প্রশান্তিরও প্রয়োজন হয়। সে-প্রশান্তি এখন আমার নেই। জায়গাটা রাত্রে যেন বিরাট হয়ে ওঠে—আমার জেলের বাতির ক্ষীণ মিটমিটে আলোয় অদ্ভুত সব ভূতুড়ে ছায়া পড়ে। সেগুলো বসে বসে দেখি আর নিজের মনে তাদের নিয়ে গল্প বুনি।

যে-ব্যারাকে আমি আছি সেটা বারো বা তার চেয়ে বেশি কয়েদী থাকবার মতো একটা চৌকো ঘর। ঘরের দু'ধারেই দু'চার হাত অন্তর গরাদ দেওয়া—এরই মাঝখানে একটি গরাদ দেওয়া দরজা। রাত্রে তাতে খিল বন্ধ করে চাবি দেওয়া হয়। ব্যারাকের একটা দিক মাটি থেকে চার ধাপ উঁচু করে বাঁধান, রাত্রে তালা বন্ধ হওয়ার পর 'ল্যাট্রিন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দিনের বেলার জন্যে একটি ছোট স্নানের ঘর ও পায়খানা ব্যারাকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গতবার যখন জেলে আসি তখন আমার জন্যে এটি তৈরি হয়েছিল, এটা সত্যি বড় কাজে লেগেছে। সমস্ত জায়গাটার সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন, ছাদের টালিগুলো না বদলালেই নয়। আমায় একটা জেলের খাট ও একটা নড়বড়ে লোহার টেবিল শুধু দেওয়া হয়েছে। ল্যাট্রিন যে-দিকে, আমার খাটটা তার উলটো দিকে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে আমি পেতেছি। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু আমি শিখেছি যে, অন্য কয়েদীরা আসবার আগে

যতটা পারা যায় সুবিধে করে নেওয়া উচিত। যেখানে আমার বিছানা পাতা তার পাশের গরাদে দিয়ে বাইরের উঠান, মায় গেট পর্যন্ত দেখা যায়। কখনো কখনো গেট খোলা ও বন্ধ করার সময় আমি সবুজ ঘাসের একটু আভাস ও রাস্তার এক টুকরো দৃশ্য দেখতে পাই। ওই দৃশ্যটুকুতে মন যে কতখানি জুড়িয়ে যায় কি বলব! আমাদের চারধারে এত উঁচু দেওয়াল যে বাইরের গাছগুলো পর্যন্ত দেখা যায় না। উঠানটার মতো এমন নীরস জায়গা কল্পনা করা শক্ত—একটি মাত্র ছোট গাছ সেখানে আছে। আমি যদি এখানে বেশিদিন থাকি তাহলে একটু বাগান করবার চেষ্টা করে দেখব।

আমাদের মহলে আর একটা ব্যারাক আছে, সেটা আপাতত খালি। আর একটি আলাদা মহলে সাধারণ কয়েদীরা থাকে। জেলটা নেহাৎ ছোট, সব সুদ্ধ মোট চুয়াল্লিশটি মেয়ে-কয়েদী থাকে। তারা সবাই দাগী-আসামী। কারু কারুর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় আছে। আর বারে যখন আমার

জেল হয়েছিল তখন তারাও এখানে ছিল। বিশেষ কোনো দরকার না থাকলে আমার মহলে তাদের আসবার অনুমতি দেওয়া হয় না। দুই মহলের দরজা খোলা থাকলে পরস্পরের সঙ্গে আমরা আলাপ করি। তারা কখনো কখনো আমার বাচ্চাদের কথা জিজ্ঞাসা করে। আগের বারই তাদের কথা আমার কাছে এরা শুনেছে। ওদিকের মহলেই সলিটারি সেল্‌গুলো আছে। ওগুলো দেখলেও আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে। কোনো মানুষকে বন্দী করে রাখার ওগুলো অযোগ্য। এখন একটি স্ত্রীলোক সেখানে আছে। কি যে তার অপরাধ আমি জানতে পারিনি, তবে রাতদিন থেকে থেকে তার কান্না শুনতে পাই। বন্দী জীবনে সব আশা হারিয়ে যে ভীত হয়ে উঠেছে, তার সেই হতাশ কান্না বড় ভয়ঙ্কর।

দুর্গী আমায় তার জীবনের কথা বলছিল। সেই সাধারণ গল্প। তার স্বামী তাকে অবহেলা করত মারত-ধরত, ভালো করে খেতেও দিত না, তাই সে

তার স্বামীকে খুন করেছে। খুন করার ব্যাপারটার ভয়াবহ বর্ণনা সে আমার কাছে করে—বর্ণনা করায় সে বেশ একটু তৃপ্তি পায় মনে হয়। তার মনোভাব বিশ্লেষণ করে আমি বুঝতে পারি যে তার তৃপ্তির কারণ হল এই যে, স্বামীকে মেরে সে শাশুড়ীকে ঘা দিতে পেরেছে। শাশুড়ীকে এখনো সে ঘৃণা করে। দু'বছরের একটি ছোট ছেলেকে বাড়িতে রেখে ছ'মাসের একটি মেয়ে নিয়ে সে জেলখানায় আসে। মেয়েটি কিছুদিন হল মারা গেছে। দুর্গা ছেলেপুলে অত্যন্ত ভালোবাসে। নিজের মেয়েটি মারা যাওয়ায় তার দুঃখের শেষ নেই, তার ধারণা কেউ গুণ-তুক্ করে তার মেয়েকে মেরে ফেলেছে। আমি যাই বলি না কেন তার ধারণা টলবার নয়। এক এক সময় সে তার ছেলের জন্য কাঁদে। ছেলের বয়স এখন এগার বছর, জেলে আসা পর্যন্ত সে তাকে দেখেনি। আমাদের উঠানে কত যে ব্যাঙ তা গুণে শেষ করা যায় না। সর্বত্রই তারা আছে। মস্ত মস্ত কুৎসিত অত্যন্ত বোকা গোছের চেহারার এই প্রাণীগুলোকে

দেখলে যুদ্ধের বাজারে যারা লাল হয়েছে সেই সব লোককে আমার মনে পড়ে। যে-গণ্ডির মধ্যে তারা ঘোরাফেরা করে, এই সব আত্ম-সুখী দম্ভভরা মানুষ তাইতেই এমন মশগুল যে বাইরে আর এক জগৎ যে আছে তা ভুলেই যায়।

বিকেলে ব্যাঙগুলো যখন ডাকতে শুরু করে, তখন আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কখনো একটি মাত্র ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, কখনো ক্রমবর্ধমান এমন ঐক্যতান শুরু করে যে মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কাল তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে না দেখে মস্ত বড় একটা ব্যাঙ মাড়িয়ে ফেলেছিলাম। কি বিশ্রী যে লেগেছিল! কিন্তু ব্যাঙটা এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে লাফাতে লাফাতে উঠানে চলে গেল।

১৯৪১ সালে আমার জেলের কামরায় যে ছোট বেড়ালছানাটা থাকত এখন সেটা একটা মস্ত বিশ্রী বেড়াল হয়ে উঠেছে। যা কিছু সামনে পায় সবই সে চুরি করে খায়। এক রকম আধপেটার বেশি আহার তার কখনো জোটে না, তাই তাড়িয়ে দেওয়াও যায়

না। তার প্রতি সদয় হওয়াও কিন্তু আমার পক্ষে শক্ত, কারণ বেড়াল আমার ঠিক সয় না। বেড়ালের কাছে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়। এ-পর্যন্ত, ছোট বা ধেড়ে কোনো রকম ইঁদুরের উপদ্রব এ ব্যারাকে হয়নি, তবে তারা আসবে আমি জানি। ১৯৪১ সালে একটি ধেড়ে ইঁদুর-পরিবার এখানে একচ্ছত্র রাজত্ব করে আমার জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল।

জেলের দুই মহলের দরজা খোলা থাকার সময় আমি ক'টি পরিচিত মুখ দেখতে পেয়েছি। শরবতী এখনো এখানে আছে। শেষবার তাকে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে এখন যেন আরো রোগা ও অসুস্থ মনে হল। তার কাছে শুনলাম সে পুরানো অসুখ এখনো তার আছে—মাঝে মাঝে কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে। নারাণীও এখনো জনি ওয়াকারের মতো বাহাল তবিয়তেই আছে। শুনলাম গত বছর একদিন উঠানের নিমগাছে উঠে কাপড়ের একদিক নিজের গলায়, আর একদিক গাছের একটা ডালে বেঁধে

আত্মহত্যা করবে বলে শাসায়। জেলময় দারুণ হৈচৈ। সবাই মিলে তাকে আত্মহত্যা না করবার জন্যে অনুরোধ করতে থাকে, সেও শাসাতে থাকে যে তার মেয়াদ কমিয়ে না দিলে সে আত্মঘাতী হবেই। মেট্রনের অনুরোধে ও ধমকে যখন কোনো ফল হল না তখন সুপারিনটেনডেণ্টকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে কি ভোজবাজি যে করলেন জানি না, কিন্তু সে নেমে আসতে রাজী হল। তবু শেষ পর্যন্ত নাটুকে-পনা তার চাই-ই। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পাঁজরার একটি হাড় ও একটি হাত সে ভাঙল। বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই তার হাতের দাগ সে আমায় দেখালে।

নারাণীকে আমি একটু ভয় করি। এই নিয়ে এগার বার সে জেল খাটছে। এবার চুরির জন্যে তার সাত বছর জেল হয়েছে। তার চেহারা একেবারেই মেয়েলী নয়। মিশকালো রঙ, তার ওপর কদমছাঁট চুল ও ভাঙা কতকগুলো দাঁতের দরুন চেহারাটা মোটেই মনোরম নয়। শরীরে কিন্তু বেশ ক্ষমতা রাখে, বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও বেড়ালের মতো

তর-তর করে গাছে উঠতে পারে। কাপড়-চোপড়ের ঝামেলা সইতে সে নারাজ, নেহাত যা না পরলে নয় তাই পরে থাকে। রঙ-চঙের ওপর তার খুব ঝোঁক আছে। এককালে কি রকম রঙ-বেরঙের কাপড় তার ছিল, তার গল্প করতে করতে একেবারে গদগদ হয়ে ওঠে। যতক্ষণ তাকে কেউ না ঘাঁটায় ততক্ষণ সে খুব ভালোমানুষ। কিন্তু একবার ক্ষেপে উঠলে রাগ তার একেবারে পিশাচের মতো। গালাগাল সে এমন দিতে পারে যে একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। তবে বেশির ভাগ তার রাগ এক পশলা কান্নাতেই সারে।

আরও অনেক চেনা-মুখ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের নাম মনে নেই। হয়তো পরে মনে পড়তে পারে।

এখানকার মেয়ে-ওয়ার্ডার ক'টি বড় অদ্ভুত। মোট তারা পাঁচটি—জোহরা, জয়নাব, বিষ্ণুদেই, শ্যামা আর মিসেস সলমন।

জোহরা একটি ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোক। অসম্ভব নোংরা তো বটেই, তার ওপর তেমনি খোসামুদে স্বভাব। দেখবা-

মাত্রই মনে হয় অবিশ্বাসী। জয়নাব মোটা, ঠাণ্ডা ধরনের স্ত্রীলোক, খুব কথা বলতে ভালোবাসে। কথায় কথায় আগেকার দিনের গল্প করে। জেলখানার কাজ করেও তার মন বিষিয়ে যায়নি, বেশ চমৎকার রসিক। বিষ্ণুদেই লম্বা জোয়ান, আকারে ও শক্তিতে তাকেই আদর্শ ওয়ার্ডারনী বলা যায়। জেলের ইউনিফর্মে তাকে বেশ জমকালো দেখায়, সে চুপ-চাপ থাকে, বেশি কথা বলে না। শ্যামা সেই ধরনের নগণ্য স্ত্রীলোক যাকে চোখেই পড়ে না। সকলের মধ্যে মিসেস সলমনকেই ভালো মনে হয়—মানুষ হিসাবে সবার ওপরে তো বটেই, স্বভাবটিও ঠাণ্ডা। খৃষ্টান বলে সে নিজেকে আর সকলের থেকে আলাদা করে দেখে। ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত আরও অনেকের মতোই তার অবস্থার তুলনায় চালচলন অনেক উঁচুস্তরের হয়ে গেছে। টাকা-পয়সার অভাব তাই তার ঘোচে না। তার সাংসারিক সমস্যার কথা আমি ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছি—সে-সমস্যা এত বেশি যে সেগুলির কথা বলেই বেচারাকে একটু

শান্তি পাবার চেষ্টা করতে হয়। মুখটি তার সুন্দর, চোখ দুটি কোমল, চুল শাদা। জেলের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট এটা বড় দুঃখের কথা।

২০শে আগষ্ট ১৯৪২

দরজার চাবি খোলবার আগেই আজ আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে আমি ছাদটা লক্ষ্য করছিলাম। ব্যারাকটার এখন আগের চেয়ে ভগ্নদশা। ছাদ থেকে প্রতিদিন চাঙড়া খসে পড়ে আমার বিছানা, মেঝে সব নোংরা হয়ে যায়। টালিগুলো এমন বিশ্রী ভাবে সাজান যে রোদ-বৃষ্টির কোনো মানাই নেই। আজকাল রোদের তেজ বড় বেশি, আমায় তাই প্রায় সমস্ত দিন রঙিন চশমা পরে থাকতে হয়। মেঝেটা এমন এবড়ো-খেবড়ো যে, রাত্রে হাঁটতে গেলে হোঁচট না খেয়ে উপায় নেই। বাদুড় আর ব্যাঙ তো হামেশাই আসছে-যাচ্ছে। সারাক্ষণ আমি তাদের ভয়ে ভয়ে আছি।

মাঝ রাত্রের পর বসে এই সব কথা লিখছি, কারণ

এই সময়টাই মনে হয় সব চেয়ে শান্ত। আজ সমস্ত দিন বড় বেশি গোলমাল গেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কয়েদী-গুন্তির আওয়াজ সত্ত্বেও রাতটা খুব নিস্তব্ধ ও শান্তিময়। কয়েদী-গোনা অবশ্য সারারাত কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তরই চলে।

আমি আমার গরাদ-দেওয়া জানালার পাশে বসে আকাশের ঝিকমিক-করা তারাগুলো দেখছি। ওদের দেখলে মনে কেমন জোর পাই। 'তাদের পরিবর্তন নেই,' সব সময়ই অবিচলিত, প্রশান্ত। মানুষের ভুল ভ্রান্তিতে তাদের কিছু আসে-যায় না। এক এক সময় চাঁদের একটু আলো ঘরে এসে মেঝের ওপর রুপোলী খানিকটা জলের মতো পড়ে থাকে। কখনো কখনো মাথার উপর এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনতে পাই—মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই সব লোহার গরাদ ভেঙে আমিও উড়ে যেতে চাই। মানুষকে এ-ভাবে বন্দী করে রাখা নিরর্থক—এতে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না, শুধু নতুন বাধার সৃষ্টি হয়। পৃথিবী বৃত্তাকারে ঘুরছে, যেখান থেকে

আমরা যাত্রা করি সেখানেই আমরা চিরকাল ফিরে আসি। প্রগতি একটা শব্দ মাত্র ; কি যে তার মানে ভেবে পাই না।

আজ আমার একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হয়ে গেছে। একজন কয়েদীর কোনো এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হবার কথা ছিল। আত্মীয় বেচারা অনেক কষ্টের পয়সা খরচ করে অনেক দূর থেকে এসেছিল। আসবার পর এক ওয়ার্ডারনী তাকে বলেছে যে ঘুষ না দিলে দেখা করতে সে পাবে না। সাধারণতঃ এইটেই নিয়ম। কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনরাও এই কথা জানে। যে দেখা করতে এসেছিল প্রথমে সে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বলে যে সে অত্যন্ত গরিব, টাকাকড়ি দেবার তার ক্ষমতা নাই। অবশেষে দুটি টাকা সে কোনোমতে বার করে দেয় এবং ওয়ার্ডারনী তা গ্রহণও করে। কিন্তু কয়েদী-মেয়েটিকে বার করে আনার সময় সামান্য একটু ছুতো করে ওয়ার্ডারনী তার সঙ্গে ঝগড়া বাধায় এবং দেখা করবার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে আবার তাকে কামরায় ফেরত

পাঠিয়ে দেয়। অবশ্য আসল কারণ আমরা সবাই জানি। বেচারি সারাদিন চীৎকার করে কেঁদেছে, আর তার বন্ধুবান্ধবেরা জেলের ওপরওয়ালাদের গাল পেড়েছে।

ঘুষ যে কি পরিমাণে এখানে চলে ভাবলে গা রি-রি করে ওঠে। ঘুষের নানান ফিকির আছে, কখনো কখনো খোলাখুলি ভাবেই দেওয়া হয়। জেফ্রে মৈনশূল বলেন, "জেলখানা হল মানুষকে জ্যান্ত কবর দেবার জায়গা। ছ'মাস জেল খেটে মানুষ যত আইনের কথা জানতে পারে ওয়েস্টমিনস্টারে একশো পাউণ্ড দিয়েও তা জানা যায় না। জেল একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্ব, দুঃখের রাজ্য, বেদনার মানচিত্র। ঝোঁক থাকলে কোনো ছেলে ছ'মাসে এখানে এত বদমাইশিতে পাকা হতে পারে যা কুড়িটা 'বোল' খেলবার জুয়ার আড্ডা, পতিতালয় বা সাধারণ কোনো জায়গায় সম্ভব নয়; আর বৃদ্ধ লোক মেকিয়াভিল্লির শিষ্য হয়ে যা না পারে এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি ফন্দি শিখতে পারে। প্লেগের

সময় রুগীদের আস্তানায় যত না রোগের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে রোগ তার চেয়ে অনেক বেশি, আর গরমের দিনে লর্ড মেয়রের কুকুরশালেও এত দুর্গন্ধ হয় না।”

২১শে আগষ্ট ১৯৪২

কাল রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি, ব্যারাকের এদিক থেকে ওদিক শুধু পায়চারি করেছি। তার পর খানিকটা পড়লাম; কিন্তু চোখ দুটো ক্লান্ত হওয়া ছাড়া ঘুমের কোনো নাগালই পেলাম না। চোখ বুজে শুয়ে পড়ে ভাবলাম হয়তো একটু তন্দ্রা আসবে, কিন্তু তা ভাগ্যে নেই। বারোটা, একটা, দুটো, তিনটে, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে-করতে, সব ক’টা ঘণ্টা বাজাই শুনলাম। তিনটের পর ঘুমিয়ে পড়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি, আগের দিন কারা-জীবন সম্বন্ধে যা ভেবেছি, তা থেকেই বোধহয় তার সূত্রপাত।

আমি যেন একটা নির্জন জেলের কামরায় আছি।

ঘরটা যেন অত্যন্ত ছোট, সোজা হয়ে দাঁড়ালে ছাদে প্রায় মাথা ঠেকে যায়, হাত বাড়ালে দু'দিকের দেয়াল আমি ছুঁতে পারি। ছাদটা ফুটো, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা সেখান থেকে আমার মাথায় গড়িয়ে পড়ছে। আমার মাথা ছুঁতে-না-ছুঁতে বৃষ্টির ফোঁটা গুলো যেন টাকা হয়ে যাচ্ছে। মাথায় দারুণ লাগছে বলে আমি চীৎকার করে বেরুবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কামরার দরজায় তালা দেওয়া, বেরুবার কোনো উপায় নেই। রুপোর বৃষ্টি যেন পড়ছেই, আমার মাথায় যেন তাতে একটা ফুটো হয়ে গেল। যন্ত্রণা এত অসহ্য যে আমার মনে হল আমি আর বাঁচব না। তারপর হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম। আমি আমার বিছানাতেই ব্যারাকে শুয়ে আছি—বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ফুটো ছাদ থেকে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা সত্যিই আমার কপালের ওপর এসে পড়ছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওয়ার্ডারনীদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে, ওধারের মহলে কোনো কয়েদীকে তারা ধমক দিচ্ছে।

এই স্বপ্নের পর আর ঘুমনো সম্ভব নয়, তাই শুয়ে শুয়ে কেমন করে ক্রমশঃ আলো ফুটে ওঠে আমি তাই দেখতে লাগলাম। খানিক বাদে বিউগ্‌ল্‌ বেজে উঠল, দরজা খোলার সময় হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত বলে আমি বিছানাতেই শুয়ে রইলাম, দিনের ঝক্কি পোয়াবার কোনো গরজ বোধ করছি না। শুয়ে থাকতে থাকতে বহুদিন আগে পড়া একটা পুরানো কবিতা আমার মনে পড়ল—

হিমেল বাথফিল্ডসের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে
নির্জন এক কারাকক্ষ দেখে শয়তান বড় খুশি।
কারণ নরকের কারাগারের উন্নতি করবার মতো
একটা ইঙ্গিত সে সেখানে পায়।

নরকের কারাগারগুলো কি-রকম আমি অবশ্য জানি না, তবে শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে যদি পৌঁছোই তাহলে বৃটিশ ভারতের জেলগুলোর যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করছি, তা থেকে শয়তানকে নরকের কারাগারের উন্নতি করবার বেশ দু'চারটে মতলব বাতলে দিতে পারব! জেলার, মেট্রন,

ওয়ার্ডারনী প্রভৃতি কয়েকজন যোগ্য লোকের হয়ে তার কাছে সুপারিশ করতেও পারব। কাজ তো তাদের সেখানে চাই, যে-কাজে তারা হাত পাকিয়েছে, তার চেয়ে ভালো কাজ কি সেখানে থাকতে পারে ?

গত বছর অন্য ব্যারাকের গায়ে লাগান একটা ছোট ঘরে আমি কয়েদীদের ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা-ধুলো করবার ও থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। সকালে উঠে প্রথমেই সেটা দেখতে গেলাম। দেখলাম সেটা এখন অর্ধেক অফিস অর্ধেক ভাঁড়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালে আঁকা ছবিগুলো প্রায় মুছে গেছে, বিশেষ করে যে মাটির খেলনা তৈরি করিয়ে-ছিলাম, তাকের উপর তারই ভাঙা টুকরোগুলো পড়ে আছে, ছেলেমেয়েদের বসবার মাছুরটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, ব্ল্যাক বোর্ডটা ভেঙে গিয়ে ধুলোয় ময়লা হয়ে এক কোণে পড়ে আছে। এ-সব দেখলে দুঃখ তো হবারই কথা, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। মায়েরা ছাড়া পাবার

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চলে গেছে, কিন্তু পুরানো দলের দু'চারজন এখনো আছে। তাদের কেউ দেখে-শোনে না, একেবারে অসভ্য বুনো হয়ে গেছে। আর বছরে যা সামান্য কিছু তাদের শেখাতে পেরে-ছিলাম, সব তারা ভুলে মেরে দিয়েছে, বদ অভ্যাস গুলো আবার দেখা দিয়েছে। যাম্‌নী দেখলাম দোক্তা চিবোচ্ছে। তার মা ছাড়া পেয়ে মাস কয়েক বাইরে ছিল, আবার চুরির জন্যে ধরা পড়ে জেলে এসেছে। সে বললে যে, যাম্‌নীর দোক্তা ছাড়া আজকাল চলে না। মুনসী গত পনর মাসে এক ইঞ্চিও বাড়েনি, তার সামনের দাঁতগুলো পোকা ধরা—আরও রোগা ও দুর্বল হয়ে গেছে। শুধু তার চোখগুলো এখনো ঠিক তেমনি সুন্দর। সাত বছর যে তার বয়েস বিশ্বাসই হয় না।

নতুন একটি ছোট মেয়ে এসেছে, নাম তার শাক্কো, ভারি মিষ্টি মেয়েটি। বয়েস তার আড়াই বছর, কটা চোখ, গায়ের রঙ সোনালী, চুলের রঙ লালচে। তার মা দাগী-চোর, এই সাতবারের বার চুরির দায়ে ধরা

পড়ে এসেছে—ডাইনীর মতো কুৎসিত তার চেহারা। শাক্কো যে তারই মেয়ে ভাবতে অবাক লাগে। এই তিনটি ছাড়া আরও একটি ছেলে আছে, তাকে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মনে হয় না।

এ-বছর কয়েদীদের নিয়মিত ভাবে হিন্দি ও উর্দু শেখান হয় না জানতে পারলাম। শিক্ষয়িত্রী মিসেস বোথাজু রোজ সকালবেলা ওয়ার্ডারদের ছেলেদের পড়াবার জন্যে তাদেরই কোয়াটারে একটা ক্লাশ বসান। মেয়ে-কয়েদীদের ছেলেমেয়েরা দরকার হলে সেখানে গিয়ে পড়ে। বিকেলে মিসেস বোথাজুর মেয়ে কয়েদীদের পড়াবার কথা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার তো কোনো চিহ্নও দেখিনি। মেয়েদের কাছে লেখা-পড়াটা বিষ, আর শিক্ষয়িত্রীও ছুটি পেলে বেঁচে যান। পরিদর্শনের দিন বই শ্লেট সবই চোখে পড়ে, কিন্তু পরিদর্শন করতে যাঁরা আসেন, সত্যিই কোনো কিছু লেখাপড়ার উন্নতি হচ্ছে কিনা, দুটো প্রশ্ন করে জানবার কথা তাঁদের মনেও হয় না।

২২শে আগষ্ট ১৯৪২

আজ বেলা দুটোর সময় হঠাৎ প্রবল ভাবে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে সব ভেসে গেল। তারপর আধ-ঘণ্টা বিছানাটাকে নিরাপদ জায়গায় রাখবার জন্যে টানাটানি করে কাটল। গরাদগুলোর ভিতর দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে, ছাদ থেকেও ঝর-ঝর করে পড়ছে। শেষকালে আমি বিছানায় শুয়ে পড়ে কোনো রকমে পা গুটিয়ে রইলাম। পায়ের দিকটা ভিজে যেতে লাগল। বৃষ্টি যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। আকাশ এখন পরিষ্কার ও নীল। কিন্তু বড় গুমোট মনে হচ্ছে। আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় আর খাবার জিনিস যা আছে তাতে ছাতা পড়ে যাচ্ছে। সব কিছুতে, এমন কি যে-পোশাক আমি পরে আছি, তাতে পর্যন্ত বিশ্রী গন্ধ। জেলের পোশাক যখন পরতে হবে, তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবছি। খাদি পরার অভ্যেস আছে এই রক্ষে।

আমার বইগুলো নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। নতুন নিয়মে সব বই-কাগজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মারফত আসবে। তার মানে অর্ধেক বই এসে পৌঁছবেই না, আর বাকি অর্ধেক পৌঁছতে বহু হপ্তা কেটে যাবে। কিছু পড়বার মতো না-থাকবার কথা ভাবলে আমার রীতিমতো আতঙ্ক হয়। দিনগুলো এখানে কাটতেই চায় না, আর জেলের রাতগুলো মনে হয় অন্য জায়গার চেয়ে কয়েক ঘণ্টা বড়। সময় যেন এখানে দীর্ঘতর হয়ে যায়। 'প্রত্যেক দিন যেন একটা মাস, প্রত্যেক মাস যেন একটা বছর।' শেষ পর্যন্ত মনে হয় যেন একটা গোটা শতাব্দী কাটিয়েছি। সুপারিনটেনডেণ্ট আমার জন্মদিনে জিজ্ঞাসা করলেন আমার বয়স কত। বললাম, "জানিনা। আমার মনে হয় যেন কত শতাব্দী আমার কেটে গেছে।" পরে মনে পড়ল এক জায়গায় পড়েছি, 'কোনো ঘটিকা যন্ত্র, কোনো ডায়েরির দ্বারা সময়ের সত্যকার পরিমাণ হয় না, হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারাই শুধু তা মাপা যায়। হৃদয় মন যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সময়ও স্তব্ধ, অচল। হৃদয় যখন জাগ্রত

তখন উদ্বেগ, বেদনা, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়, বারোটি ব্যর্থ জীবনে যা না পাওয়া যায়, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সম্ভব। সুদীর্ঘ সময় আমরা চাই না, আমরা শুধু চাই যে, যেটুকু সময় আমাদের আছে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন তা উপভোগ করতে পারি।' এই 'সমস্ত হৃদয়ের উপভোগের' দরুনই বোধহয় এখন আমার মনে হচ্ছে যেন বহু শতাব্দী ধরে আমি বেঁচে আছি।

অন্যদিনের চেয়ে আজ এখানে ঝগড়াঝাটি একটু বেশি হয়েছে। এমনকি এখন সব তালা-বন্ধ হবার পরও শান্তি নেই। রাত্রির মাধুর্য কর্কশ সব আওয়াজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার সময় গরাদগুলোর ধারে বসে আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে, কখন তারা উঠবে আমি সেই আশায় থাকি। তারাদের ঝিকিমিকি দেখতে অপরূপ লাগে। এ-পর্যন্ত চাঁদ দেখা দেয়নি, তবে আশা করছি পরে দেখতে পাব। চাঁদের ওপর বিশেষ ভরসা রাখা যায়না। সে শৌখিন রঙ্গিনী, তার মেজাজের অন্ত

পাওয়া ভার। জেল-টেল তার ভালো লাগে না, তবে কখনো কখনো দেখি মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। মাঝে মাঝে আমায় যে এখনো তার মনে আছে, জানাবার জন্যে একটু রুপোলী জ্যোৎস্না পাঠিয়ে সে আমায় সম্ভাষণ করে।

২৩শে আগষ্ট ১৯৪২

কাল রাত্রে আবার আমার ঘুম হয়নি। সকালে যখন উঠলাম তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। এর ওপর শরীরে নানান রকম ব্যথা ও যন্ত্রণা, মনটাও বড় দমে গেছে। সারা সকালটা কিছু না করে কাটালাম, লিখতে, পড়তে বা কিছু করতেই ভালো লাগলনা। বৃষ্টির জন্যে উঠানে যাবার উপায় নেই, কামরার ভিতরেই ঘণ্টা-খানেক পায়চারি করলাম। অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করছিলাম, সত্যিই যেন খাঁচায় বন্দী। শেষকালে শুয়ে পড়লাম। বিকেলে মেট্রন চারটে বই নিয়ে এল, একজন বন্ধু পাঠিয়েছেন। 'একটু বেশি মানে কত-খানি বেশি!' আমার মন এক মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে

উঠল। আমার কথা একজনের মনে পড়েছে, বাইরের জগতের সঙ্গে এইটুকু যোগাযোগই এখানকার জীবন সওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। বইগুলো ভালো লাগবে মনে হচ্ছে, সন্ধ্যাটা কি করে কাটবে সেই ভয় আর নেই।

২৪শে আগষ্ট ১৯৪২

জেলের জীবনেও হাস্যরসের খোরাক আছে। কাল মেট্রন বলছিল, "জানেন, আপনার রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়না, তাই সকালে আপনার কামরার দরজা খোলবার সময়, আপনি যাতে জেগে না ওঠেন আমি সেই চেষ্টা করি। তবে ভাবছিলাম আপনাকে ডেকে তোলাই আমার উচিত, কারণ ধরুন, রাত্রে যদি মারা যান, তাহলে সকালে আমি জানব কি করে।" খুব সান্ত্বনাদাত্রীই আমার মিলেছে বটে! রাত্রে মারা যাব ভাবলে আনন্দ হবারই কথা! তবে এর চেয়ে দুঃখের মৃত্যুও আছে।

আমার জন্মদিন উপলক্ষে মেয়েরা যে-সব বই পাঠিয়ে-

ছিল, তার একখানা বই আমি পড়েছি। বইটির নাম 'এস্‌কেপ্‌ ফ্রম্‌ ফ্রীডাম্‌', বইটি লেখা বড় চমৎকার, পড়তে বসলে ছাড়া যায় না। যে-বইটিতে নাটকের সংগ্রহ আছে, সেইটি খুব দুঃখের দিনে পড়বার জন্যে রেখে দিয়েছি। এ-রকম দুঃখের দিন খুব তাড়াতাড়ি যাতে না আসে, এইটুকুই শুধু প্রার্থনা করি। অন্ধকার দিন কাকে বলে তা আমার জানতে বাকি নেই, সে-অন্ধকার সবে একটু ফিকে হতে শুরু করেছে। আশা করছি শিগগিরই দিনগুলি রঙিন হয়ে উঠবে। আমি আশাবাদী, এই আমার সৌভাগ্য।

কাল বিকেল চারটার সময় আর একজন রাজনৈতিক বন্দিনীকে এখানে আনা হয়েছে। তিনি আর. এন. এস.-এর স্ত্রী, তাঁর স্বামী ও শ্বশুর আগে থাকতেই জেল খাটছেন। কোনো রকম রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ধরা হয়েছে। তাঁর সাত বছরের একটি মেয়ে আছে। তাকে দেখবার কেউ নেই বলে, তাঁর মন বড্ড খারাপ। খানিক পরে আরও চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। আর কেউ নয়, স্বয়ং পূর্ণিমা

এসে হাজির, তাকে দেখে বড় খুশি হলাম। অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে গল্প করেছি। তারপর ভোর পর্যন্ত আমার আর ঘুম হয়নি। উঠানটা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, একরকম সুন্দরই লাগছে বলা যায়। কিন্তু জেলখানায় সৌন্দর্যেও মন অস্থির হয়ে ওঠে।

আজ আবার প্যারেডের দিন, সেই অকারণ ব্যস্ততা। মিঃ গার্ডেনারের কাছে শুনলাম যে ঊর্ম্মিলা ত্রিপাঠী, আমাদের মতো দু'নম্বর বন্দিনী। তাকে আগুন দেওয়া ও লুটের অপরাধে ধরা হয়েছে। সম্ভবতঃ তাকে সাধারণ কয়েদীর শ্রেণীভুক্ত করা হবে। ব্যাপারটা একেবারে বিশ্বাস করা যায় না। উৎসাহ বা ক্ষিপ্রতা যাতে দরকার হয় এমন কোনো কাজ ঊর্ম্মিলার পক্ষে করা সম্ভবই নয়। ঊর্ম্মিলা নেহাৎ বোকাসোকা গোছের ভালোমানুষ, ঘরসংসার ছাড়া আর কিছু সে বোঝেনা, রাজনীতির কিছুই জানেনা।

দিনটা অসম্ভব গরম। সমস্ত দুপুর প্রচণ্ড রোদে ব্যারাকের ছাদ যেন পুড়ে গেছে।

২৫শে আগষ্ট ১৯৪২

কাল রাত্রে যেমন গুমোট তেমনি গরম। কিন্তু সমস্ত রাত উঠানটা রুপোলী জ্যোৎস্নায় ভরে ছিল। সকালেও বেশ গরম, দিনটা আজ খারাপ যাবে মনে হচ্ছে। সকাল থেকেই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, 'অ্যাসপ্রো' খাওয়া সত্ত্বেও যেন দপদপানি আরও বাড়ছে। ভয় হচ্ছে দিনটা আমার পক্ষে সুখের হবে না।

২৬শে আগষ্ট ১৯৪২

পূর্ণিমা তার সঙ্গে একটা ক্যালেণ্ডার এনেছে। প্রথমে সেটা দেখে খুশিই হয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি ওতে মনটা বড় চঞ্চল করে দেয়। অন্য সব দিন থেকে আলাদা—অপেক্ষা করে থাকবার মতো দিন যখন নেই, তখন ক্যালেণ্ডার থেকে লাভ কি? আমাদের তারিখ না দেখাই ভালো, দিন গুণেও কোনো লাভ নেই।

কাল ঠিক তালা বন্ধ করবার একটু আগে জানকী

দেবী বলে আর একটি মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে। এই জেলার কোনো ছোট ষ্টেশনে আগুন দেওয়া ও লুটের ব্যাপারে তিনি ছিলেন, এই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। সরাসরি তাঁকে আমাদের মহল থেকে বার করে একটা 'সলিটারী সেলে' পুরে দেওয়া হল। মেট্রনকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, পুলিশের ঐ রকমই আদেশ। আমরা প্রতিবাদ করে মেট্রনকে জেলের নিয়মকানুনের বই দেখতে বললাম, সুপারিনটেনডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। দুজন মেয়েকে যখন একই অপরাধে ধরা হয়েছে, তখন তাদের প্রতি দুরকম ব্যবহার করা কোনো-মতেই উচিত নয়। প্রায় একঘণ্টা বাদে মেট্রন ফিরে এসে, ঊর্মিলা ত্রিপাঠীকে যে-ব্যারাকে রাখা হয়েছে, সেইখানেই জানকী দেবীকে রেখে গেল। পূর্ণিমা ও আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম।

আজ সকালে জানকী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার সঙ্গে কথাও বলেছি। মেয়েটি বিধবা, এলাহা-বাদে নর্মাল স্কুলে পড়ে। বেশ বুদ্ধিমতী মনে হল।

গরম আর কমছে না। ব্যারাকটা যেন একটা উনুন। সারাক্ষণ মুখ ও গা বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। মাথাটারও যন্ত্রণা হচ্ছে। রাতদিন এত সব ব্যথা ও যন্ত্রণায় ভোগার জন্যে নিজেরই আমার লজ্জা হয়। আগে আগে দু-একদিনের মধ্যেই জেলের জীবনের সঙ্গে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতাম, প্রত্যেকটি মুহূর্তই কিছু না কিছু কাজে লাগতাম। মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যেত বটে, এক-আধবার মেয়েদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠতাম—কিন্তু এখনকার অবস্থা একেবারে আলাদা। কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছি না, ঘরের ওদিকে চেয়ে দেখছি পূর্ণিমারও অবস্থা আমারই মতো! দেখা যাক, আশা করি সময়ে আমরা মানিয়ে নিতে পারব।

শুনলাম আজ রাখী-বন্ধনের দিন। আজ সকালে মিসেস বোথাজু তার হাতে একটা ঝলমলে হলুদ রাখী বেঁধে এসেছিল। তার আবলুশ কালো চামড়ার সঙ্গে যা চমৎকার মানিয়েছিল! এই মধুর উৎসবের এই পরিচয়টুকুই শুধু আমরা জেলে পেলুম।

অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনকার মতো গরমটা কমেছে।

২৭শে আগষ্ট ১৯৪২

'দৈনিক খুটিনাটির উপরে আমার মন যেন উঠতে পারে, সেই শক্তি আমায় দাও।'

আর একটি দিন, কিন্তু গতকাল ও তার আগে যে-সব দিন গিয়েছে ঠিক তারই মতো, কোনো তফাৎ নেই। এমন অসাড় নিজেকে মনে হয়, যেন ভাববার ও অনুভব করবার ক্ষমতা চলে গেছে। 'মাথায় আমার যন্ত্রণা, অসাড় তন্দ্রায় মন আমার আচ্ছন্ন…'

মেট্রনের জন্য জয়নাব আজ কতগুলো রঙিন রাখী এনেছে। হিন্দুর ঘরে তার জন্ম, কিন্তু অতি অল্প বয়সে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে দেওয়া হয়। সেই লোকটিকে এত দিনের মধ্যেও সে ছাড়েনি। তাকে আরামে রাখবার জন্যেই এই খাটুনি খাটে। হিন্দু পূজা-পার্বন সব সে মানে, গঙ্গাস্নান পর্যন্ত করে। সে

অত্যন্ত ভদ্র, অন্য সবাইয়ের চাইতে ঝগড়া সে কম করে, এবং সাধারণতঃ শান্ত ও হাসি খুশি। এই প্রশান্তির দরুনই ফুলতে ফুলতে আর এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে এখন তাকে দূর থেকে নানা রঙের টুকরো-কাপড়ের তৈরি একটি বিশাল বলের মতো মনে হয়। ভারিক্কি হাঁসের মতো তার চলার ভঙ্গীতেও একটা পরিতৃপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা যে বন্দী হয়ে আছি এ নিয়ে তার দুঃখ দুর্ভাবনার অন্ত নেই। আমার বাড়ির লোকেদের জন্যে প্রায়ই সে প্রার্থনা করে। আমার খাওয়ার ব্যাপারেও সে বিশেষ চিন্তিত। আমায় উচিত মতো খাবার জন্যে সে কেবলই পীড়াপীড়ি করে। শুধু রুটি মাখন আর এত চা খেয়ে কেউ আছে দেখলে তার কষ্ট হয়। আমি যখন তাকে তার বিশাল দেহটি দেখিয়ে বলি যে, ওরকম ফুলে ওঠবার আমার কোনো বাসনা নেই, তখন সে আকাশের দিকে চোখ তুলে বলে, "খাওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই— এ হল কিসমৎ।" জাপানীরা যদি এ-দেশ আক্রমণ

করে আপাততঃ সেই ভাবনায় সে একটু অস্থির। কারণ সে শুনেছে জাপানীরা নাকি মানুষ খায়, আর এই চেহারা নিয়ে সে যে দৌড়ে পালাতে পারবে না তা সে জানে। কি নিদারুণ চিন্তা!

২৮শে আগষ্ট ১৯৪২

আবার একটা অত্যন্ত গরম দম বন্ধ করা দিন—মাছি, মশা, পিঁপড়ে ও সর্বপ্রকার পোকা-মাকড়ে ব্যারাক ভর্তি হয়ে আছে। সারাক্ষণ ঘামে নেয়ে যাচ্ছি, ঠিক যেন একটা ছোটখাট টার্কিশ বাথে আছি। আকাশে মেঘের হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি এখনো হয়নি। লেখা সেদিন 'লাইফ' আর 'টাইম' কাগজের ক'টা করে কপি পাঠিয়েছে। কাগজগুলোর দৌলতে কয়েক ঘণ্টা নীরস সময় তবু ভালো ভাবে কাটাতে পেরেছি। বিজ্ঞাপনগুলোও সব সময় পড়তে মজা লাগে। এগুলো পড়তে পড়তে আমার রিভুর কথা মনে পড়ে।

রঞ্জিত সেই যে তিন হপ্তা আগে বম্বে গেছেন, সেই

থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাইনি। আমার ভাবনা হচ্ছে। তাঁকে চিঠি লেখবার সুযোগ থাকলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান হতে লিখতাম। ভাই যে কোথায় আছেন তাও জানি না। ভালো যেন থাকেন, কোনো কিছু কষ্ট যেন না থাকে, এই টুকুই শুধু চাই।

শুয়ে শুয়ে হাঁপানো ছাড়া এই গরমে আর কিছুই করা যায় না। আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে গরাদগুলোর ভেতর দিয়ে উঠানের গেটটা দেখা যায়। গেটের ছোট লোহার দরজাটা নিয়ে মনে মনে আমি গল্পের পর গল্প বুনে চলি। গল্পের নাম 'বন্ধ দরজার করুণ কাহিনী' দিলে বেশ শোনায়।

মেট্রন আজ বিকালে বাইরে যাচ্ছে। ফিকে গোলাপী যে-পোশাকটা সে পরে এসেছে, সেটা নাকি আগেকার সুপারিনটেনডেণ্টকে বিদায় দেওয়ার উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ভাবে তৈরি করিয়েছিল। মেট্রন মাত্রেই চুল রঙ করে কেন? অনেক দিন ধরেই এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে আছে। কোনোদিন হয়তো

আমি নিজেই গিয়ে আমার চুল ঘোর লাল রঙে ছুপিয়ে ফেলব। সে একরকম মুক্তি হবে বটে!

২৯শে আগস্ট ১৯৪২

আগের রাত্রে তেমনি হাঁপধরানো গরম ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ব্যারাকটা ক্রমশ ছোট হয়ে এসে আমাদের দম বন্ধ করে দেবে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে সমস্ত ঘর ছেয়ে ফেলেছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় তাদের সেই সমবেত আওয়াজ অসহ্য। সমস্ত রাত বিছানায় খালি এপাশ-ওপাশ করেছি। তার পর সবে যখন একটু সহ্য হয়ে এসেছে, তক্ষুনি সাড়ে চারটের সময় বিউগল বাজল। ঘুমের দফা তৎক্ষণাৎ রফা।

ব্যারাক খোলবার পর থেকে জেলখানার গোলমাল ক্রমশঃই বাড়তে বাড়তে ঘণ্টাখানেক বাদে এমন হয় যে, নিজের ভাবনাই যেন শোনা যায় না। যত ক্লান্তিই থাক, এ-অবস্থায় শুয়ে থাকা যায় না। তার পর একটু একটু করে সব যেন থিতিয়ে আসে। প্রায়

আটটা, নাগাদ যেন কতকটা শান্ত হয়। শুতে যাবার তখন আর ঠিক সময় নয়। তুপুরে একটু ঘুমোতে পাবার আশাতেই তখন থাকতে হয়। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকে, মাছির উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। গরমে ও রোদের ঝাঁজে মাথা ঘোরে, ঘরময় অসংখ্য ছোট ছোট ডাঁস জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়। এত গরম যে মুখ ঢেকে রাখা যায় না কিন্তু খুলে রাখলে মশা-মাছির আক্রমণ থেকে নিস্তার নেই। তাই বিছানায় শুয়ে হাত-পাখার বাতাসে, মশা-মাছি তাড়িয়ে ঠাণ্ডা থাকবার চেষ্টা করতে হয়। একটু তন্দ্রা এলে পাখাটা হাত থেকে যেই খসে পড়ে, মাছিদের ক্রমশঃ সাহস বেড়ে যায়। মুখের ওপর তারা ঘোড়দৌড় শুরু করে দেয়। চমকে জেগে উঠে আবার পাখা নাড়তে হয়।

৩০শে আগষ্ট ১৯৪২

আজ সকালে যখন উঠলাম, তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করছিলাম। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে কর-

ছিল না, কিন্তু উঠান ঝাঁট দেওয়ার শব্দে ও ধুলোয় বাধ্য হয়ে উঠতে হল। আন্দাজ ন'টার সময় একটু চা খেয়ে সবে পড়তে বসেছি, এমন সময় পূর্ণিমা হঠাৎ সবিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠায় গরাদের দিকে আমার নজর পড়ল। অবাক হয়ে দেখি গলায় এক-রাশ ফুলের মালা ঝুলিয়ে মেট্রনের পিছু পিছু লেখা জেলের উঠানে ঢুকছে।

প্রথমে সে কেন এখানে এল বুঝতেই পারিনি। চকিতে একবার মনে হয়েছিল, সে হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—কিন্তু তাহলে গলায় ফুলের মালা কেন? তারপর একমুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল হয়তো আমরা ছাড়া পাচ্ছি। ইতিমধ্যে লেখা ব্যারাকের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও সগর্বে সকলকে জানাচ্ছে যে, সে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে। এ-আঘাত একেবারে অপ্রত্যাশিত। লেখা জেলে! লেখা তো এখনো শিশু—রাজনীতিতে নামা দূরের কথা, রাজনীতি বোঝবার বয়সও তার হয়নি। পূর্ণিমাকে উত্তেজিত ভাবে, কি করে তাকে ধরা হল,

যখন সে বলে চলেছে তখন আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে, এই আঠার বছরের সব ছবি পর পর দেখে যাচ্ছি। প্রথম জুহুর সমুদ্রতীরে গোলগাল একটি ছোট্ট মেয়ে। তারপর সেই মেয়ে হাঁটতে ও কথা বলতে শিখেছে। লেখার প্রথম মন্তেসরি স্কুলে যাওয়া। সেই তার দারুণ অসুখ—তা থেকে আশ্চর্য ভাবে সেরে ওঠা, অনেকদিক দিয়ে পুনর্জন্মই বলা চলে। ১৯৩২শে আমি ও রঞ্জিত গ্রেপ্তার হবার ঠিক আগেই লেখার পুণার স্কুলে পড়বার জন্যে যাওয়ার কথা মনে পড়ছে। আট বছরের গম্ভীর একটি ছোট্ট মেয়ে স্টেশানে গাড়িতে বসে বড় বড় জল-ভরা চোখ মেলে নীরবে চেয়ে আছে, হাতে তার একটা বড় তিনরঙা জাতীয় পতাকা। বলেছিলাম, "ঐ বড় পতাকাটা নিয়ে কাজ নেই লক্ষ্মীটি," সে জবাব দিয়েছিল, "এটা দিয়ে পুলিশকে ভয় দেখাব।"

তারপর মনে পড়ছে রাজকোটের ঘোড়ায় চড়ার স্কুল থেকে সবে সে ফিরে এসেছে, সোয়েটার ও যোধপুরীতে চমৎকার মানিয়েছে, চোখদুটি উজ্জ্বল,

বেশ একটু উত্তেজিত। “জান মা, আমাদের মাষ্টার বলেছেন শিগগিরই আমি, ‘ককটেল’কে লাফ দেওয়াতে শিখতে পারব। কি মজাই হবে বল তো!” লেখা সাঁতার কাটছে, লেখা আরও বড় হয়েছে, এখনো সরল কিন্তু স্ফূর্তিতে ভরপূর জীবনকে নতুন করে বুঝতে শিখেছে। আঠার বছর বয়সে লেখার জন্মদিনের পার্টি—কি তার খুশি, প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিঙড়ে নিচ্ছে। তারপর লেখার শেষ ছবি মনে পড়ছে আমার ধরা পড়বার দিনে আনন্দ-ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমায় বিদায় দিচ্ছে। সে আর এক লেখা, চোখে তার নতুন উদ্দেশ্যের দীপ্তি—সঙ্কল্প তার আরও দৃঢ়। বয়স তার অল্প, কিন্তু তার ওপর নির্ভর করা যায়।

আর এখন সে এসেছে জেলে—এই তার সাবালিকা হওয়া! তার পক্ষে বোধহয় এটা না ঘটে উপায় ছিল না।

তারা আর রিতা আনন্দ-ভবনে একলা আছে, সি. আই. ডি. ও পুলিশের লোকে বাড়ি ঘেরা

এ-কথা ভেবে ভেবে আমার যন্ত্রণার শেষ নেই। সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি হাস্যকর নাটকীয় ভাবেই লেখা গ্রেপ্তার হয়েছে। কাল রাত ন'টায় পুলিশ—সশস্ত্র প্রহরী, সি. আই. ডি.র লোক ও তাদের সমস্ত আনুষঙ্গিক আনন্দ ভবনে যায়। মেয়েরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রামবাগে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিল। ইনস্‌পেক্‌টর লেখার খোঁজ করলে তাকে বলা হয় যে, সে বাড়িতে নেই। তারা খানিক-ক্ষণ অপেক্ষা করে ও লেখার ঘর খানা-তল্লাস করবার পরোয়ানা দেখিয়ে তার ঘরে যায়। সমস্ত ঘর খুঁজে সন্দেহজনক কিছু তারা পায় না। লেখা তখনো পর্যন্ত ফিরে না আসায় তারা চলে যায়। আজ সকাল আটটায় লেখাকে তারা আবার গিয়ে গ্রেপ্তার করে। লেখা বলে যে উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেও বাইরে যেন কিছুই হয়নি, জোর করে সেই ভাব দেখিয়েছে। ব্যাপারটার তার কাছে যেন বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, এইটে বোঝাবার জন্যে, আর পুলিশকে খানিক অপেক্ষা করিয়ে

রাখবার জন্যে, সে নাকি একটা টোস্ট বেশি খেয়েছে। মামাজীকে অনুকরণ করবার চেষ্টা সন্দেহ নেই।

৩১শে আগষ্ট ১৯৪২

লেখা খবর এনেছে যে ট্যাঙ্গল্ দারুন ভুগছে। ট্যাঙ্গল্ হল ছেলেমেয়েদের টেরিয়ার কুকুর। আমার অনুরোধে সুপারিনটেনডেণ্ট বাড়িতে খবর পাঠিয়েছেন যে যদি তার সারবার কোনো আশা না থাকে, তাহলে তার সব যন্ত্রণা একেবারে শেষ করে দিতে। সে ক্ষুদে বেচারী যন্ত্রণা পাচ্ছে আর কেউ তার কাছে নেই, একথা ভেবে সারারাত আমি বড় কষ্ট পেয়েছি।

সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে শুনলাম যে তিনি বাড়িতে টেলিফোন করে তারার সঙ্গে কথা বলেছেন। ডাক্তার এসে ট্যাঙ্গল্কে দেখে ওষুধ দিয়েছেন, তাতে অনেকটা ভালোও আছে। ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তিনি আশা করেন তাকে সারাতে পারবেন।

লেখার সর্দি হয়েছে। না বাড়লেই বাঁচি। জেলে অসুখ হলে বড় অসুবিধে।
আমাদের বিজ্জু ভাবী (মিসেস রামেশ্বরী নেহেরু) লাহোরে গ্রেপ্তার হয়েছেন শুনে বেশ একটু উত্তেজনা অনুভব করলাম।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪২

আজ থেকে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা করে এগিয়ে দেওয়া হল। আমাদের এতে অসুবিধাই হবে, কারণ যথানিয়মে ছ'টার সময় কামরায় তালা চাবি পড়বে কিন্তু আসলে তখন ছ'টা নয় পাঁচটা। সুতরাং বিকালের যে-সময়টি সব চেয়ে ঠাণ্ডা ও ভালো তারই একটি ঘণ্টার স্বাধীনতা আমরা হারালাম।
কাল রাত্রির হাওয়াটি ছিল বড় মধুর, মশারাও আমাদের রেহাই দিয়েছিল। অনেকদিন পরে এই প্রথম একটা রাত আমাদের আরামে কেটেছে।
আমাদের ও সাধারণ কয়েদীদের মহলের মধ্যে যেখানে গরাদ দেওয়া ছিল, সেখানকার ফাঁক বন্ধ

করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সব সাংঘাতিক লোক, দাগীবদমাশদের নিষ্পাপ মন যেন কলুষিত করে না দিই তাই এই সাবধানতা।

লেখা আর আমি বার্ণাড শ' পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। কিছু বৃষ্টি হয়ে গেছে, গুমোট কেটে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা লাগছে। শ'র নাটক শেষ করে আমরা তালা বন্ধ হওয়ার পর টমাস ব্রাউনের লেখা, 'ড্রয়িং রুম' নামে একটি হাসির নাটক পড়েছি। অনেকটা আমাদের মতো একটি পরিবারের কথা এতে আছে। বইটা পড়ে আমরা বেশ হেসেছি।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২

ঠাণ্ডা রাত। সকালে জল হয়েছিল, কিন্তু সে উড়ো মেঘের বৃষ্টি মাত্র। এখন তাই মনে হচ্ছে যে, কাল দিনের বেলায় গুমোট হতে পারে।

ট্যাঙ্গল্ আর নেই। এইমাত্র খবর এল যে, কাল রাত্রে একটা ইনজেকশান দিয়ে তাকে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আহা বেচারা!

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪২

ভাগ্যের মতো, জেলের ওপরওয়ালাদের মতিগতি বোঝা ভার। আমাদের এখন খাওয়ার জন্যে দৈনিক ন'আনা দেওয়া হয়। নতুন নিয়ম জারি হবার আগে এখানে প্রথম হপ্তায় আমাকে বারো আনা করে দেওয়া হয়েছিল। দিন আমার সাত আনার বেশি খরচ হয়না, তাই জানতে চেয়েছিলাম যে-পয়সাটা আমার বাঁচে তা আমার নামে জমা করে হপ্তায় একবার আমায় ফল দেওয়া যেতে পারে কিনা। জেলের এঁরা বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই," আমিও ভেবেছিলাম, "কি এঁদের অনুগ্রহ!" তখন কি আর জানতাম! প্রথম হপ্তায় যেমনই হোক ফল কিছু এসেছিল। তারপর থেকে চিঠি আর তাগিদ অনবরতই পাঠান হচ্ছে, কিন্তু সবই বৃথা। আমাদের পাওনা পয়সা জমছে, কিন্তু ফল আর আসছে না। আমাদের ধৈর্য-শিক্ষা হচ্ছে বটে।

এখানে এসে অবধি ঝগড়াই করছি মনে হচ্ছে। আগে আগে কখনো জেলের ওপরওয়ালাদের এত

জ্বালাতন করিনি, কিন্তু এবারে সব ব্যবস্থা একেবারে অসহ্য। ফল চাইলে দশ-বারো দিনের আগে তা পৌঁছয় না। শেষ পর্যন্ত হয়তো ছ'টি থেঁতলান কলা আমার হাতে দেওয়া হয়। আমি অবশ্য সেগুলো তৎক্ষণাৎ ফেরত দিই। তারপর দিন অফিস থেকে এক ছোট চিঠি: "কলাগুলোর দাম দেবে কে?" আমি জবাব দিই: "জেলই দেবে, আবার কে?" অফিস থেকে আরও পত্রাঘাত আসে, আমিও ফলের জন্যে অনুরোধ করে পাঠাই, আমার নামে বাকি পয়সা এদিকে জমছে। আমি যখন জানাই যে, প্রায় দু'টাকা আমার পাওনা হয়েছে, তবুও আমি ফল এখনো পাইনি। তখন আমায় বলা হয় যে, কনট্র্যাকটর বাজারে কোনো ফল পাচ্ছে না। নেহাৎ মরিয়া হয়ে আমি সুপারিনটেনডেণ্টকে লিখি যে কনট্র্যাকটর যদি একটা জোচ্চোর বদমাশ হয়, তাহলে আমাকেই তার হাতে বধ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার ফল যদি না পাই, তাহলে আমি আরও ওপরওয়ালার কাছে কেতা-

দুরন্তভাবে নালিশ জানাব। এ-চিঠিতে জেলের পায়রার খোপে রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়, আমি দুটি চমৎকার কাশ্মিরী অ্যাপেল পাই। কাশ্মিরী অ্যাপেল দুটির দামও চমৎকার। আসলে ফল পাওয়া না-পাওয়ায় আমার কিছু আসে-যায় না, এ-সব কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমার দৈনিক বরাদ্দের চেয়ে আমি কম খাই বলে, জেলকে লাভ করতে আমি দেব না।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

অত্যন্ত রাগ নিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। সন্ধ্যা থেকে কাল প্রায় সারারাত মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। সমস্ত ব্যারাক জলে ভাসছে, বসবার মতো একটা শুকনো জায়গা কোথাও নেই। রাত্রে আমার বিছানার অনেকটা ভিজে গেছে, লেখার একেবারে ভিজে সপসপে। বেশ অন্ধকার করে আছে, সব কিছুতেই মেজাজ বিগড়ে যায়। কাঠগুলো এত ভিজে যে আগুন জ্বালাতে পারছি না। ন'টা বেজেছে তবু

দুধ পাইনি। বৃষ্টি না থামলে রান্নার সওদাও বোধ হয় পাওয়া যাবে না, একটা বৃষ্টির দিনেই কেন্দ্রীয় জেলের সব ব্যবস্থা যদি ওলটপালট হয়ে যায়, তাহলে শত্রু এ-দেশে চড়াও হয়ে এলে কি হবে ভেবে শিউরে উঠছি। বর্মায় যখন সমস্ত কয়েদী ও পাগলদের গারদ থেকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়িয়েছিল অনায়াসেই অনুমান করা যায়। রান্নাঘর থেকে বাঁচিয়ে-রাখা সামান্য কিছু কয়লা দিয়ে পূর্ণিমা একটা উনুন ধরাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সে আর লম্বরদারনী ভগওয়ান দেই পাখা চালিয়ে হয়রান, কিন্তু এ-পর্যন্ত ধোঁয়ায় ব্যারাক ভরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয়নি। আগুনের এখনো দেখা নেই।

ন'টা-কুড়িতে দুধ এল। এখনও রান্নার সওদা আসেনি। শেষ পর্যন্ত একটু-আধটু করে জিনিসপত্র আসতে লাগল—পুরোপুরি এসে পৌঁছতে বেলা দুপুর হয়ে গেল। মেট্রন হপ্তার শেষে ছুটি নিয়েছে বলে বেশ হট্টগোল পড়ে গেছে।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

সমস্ত রাত কাল প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়ে সকালের দিকে থেমেছে। এখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দুধ আসতে আজকাল রোজই দেরি হয়। আসে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে, ততক্ষণ আমরা পায়চারি করে কাটাই। রান্নার সওদা আসে সাড়ে দশটা নাগাদ, তরি-তরকারি এগারটায়, পাঁউরুটি বেলা চারটায় আর ভাগ্য যদি আমাদের ভালো হয় তো বিকেলের দুধ ঠিক তালাবন্ধ হওয়ার সময় এসে পৌঁছয়, জেলে সব কিছুই এমন এলোমেলো—কারুর কোনো বিষয়ে দায়িত্ব নেই। সোজা পথ ছেড়ে সব কিছুই উল্‌টোভাবে করা হয়, দিনের পর দিন এমনি করেই আমাদের কাটে।

আমাদের সওদা যা দেওয়া হয়, তা দিন-দিন ক্রমশঃই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কোনো-কোনো জিনিস এত খারাপ যে আমরা ব্যবহারই করতে পারি না। আলু আমাদের দেওয়াই হয় না, কারণ বাজার-দর চড়া, কনট্র্যাকটরের উপরি-আদায় তার ওপর

আরও বেশি। আমাদের বরাদ্দ খরচে তা কুলানো যায় না। জেলের বাগানে প্রচুর তরি-তরকারি আছে, কিন্তু আমাদের সরবরাহ করা হয় বাজার থেকে। জেলে যা হয়, তা প্রথমে যায় বড় বড় উপর-ওয়ালাদের ঘরে। তারপর নামতে নামতে নিচেকার নানা কর্মচারীদের কাছে যা পৌঁছয়, তা থেকে তারা তাদের খোসামুদেদের কিছু-কিছু ভাগ করে দেয়। সুতরাং রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে কিছুই যে থাকে না তা বোঝাই যাচ্ছে।

কয়েদীদের জন্যে যে রান্না-করা খাবার আসে তা দেখতে যেমন ভয়ানক, খেতেও তেমনি বিস্বাদ। আমি আগে অনেকবার জেলের রান্না-করা খাবার খেয়েছি। তখনকার খাবার আহামরি কিছু ছিল না বটে, কিন্তু এখনকার মতো এত খারাপ খাবার আগে কখনো দেওয়া হতো না। ডাল বলে যা দেয় তা তো গোটা-কয়েক লাল লঙ্কা ভাসানো নোংরা খানিকটা জলমাত্র! তরকারি বরাবরই সেই এক। আমার তো বিশ্বাস না ধুয়েই তা রান্না করা হয়। ভালো করে তা

খুঁটিয়ে দেখতে সাহস হয় না, কি যে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে তা কে জানে। পরিমাণও তার অত্যন্ত কম। রুটিগুলোতেও সব বালি কিচ-কিচ করছে।

পুরুষ-কয়েদীদের মহলেই রান্নাবান্না হয়। তারপরে বড় বড় বালতিতে সেগুলো আমাদের কাছে পাঠাবার সময় বেশ কিছু চুরি হয়ে যায়। ফলে কোনো কোনো মেয়ে ঠিকমতো ভাগ পায় না। দু-একদিন অন্তর দারুণ ঝগড়া তাই লেগেই আছে।

কর্তৃপক্ষের কাছে আমার মান গেছে। কিছুদিন আগে আমি চায়ের বদলে কফি খেতে চাই বলেছিলাম। আমায় জানান হয়েছিল যে, জেলের নিয়মকানুনের বইয়ে কফির কোনো উল্লেখ নেই, শুধু চায়ের নামই আছে। তার জন্যে সরকারের মঞ্জুরির দরকার। সুপারিনটেনডেণ্ট বলেন তিনি তার জন্যে চেষ্টা করবেন। তিন হপ্তা বাদে আমায় বলা হল যে, আমি যদি চা না খাই তাহলে এক টিন কফি কিনতে পারি। আমি আধ পাউণ্ড কফি আনতে

দিলাম, বাজারে যার দাম চোদ্দ আনা, কনট্র্যাকটার তার জন্যে আমার নামে দাম ধরলে পাঁচ সিকে। দৈনিক আমাদের বরাদ্দ হল ন'আনা। সুতরাং দু'দিনের বরাদ্দর ওপর আরও দু'আনা আমায় দিতে হল। কফি যা পেয়েছি তা পনরো দিনের বেশি আমার যাবে না। সুতরাং প্রতি দু'হপ্তায় দু'দিন করে আমায় রান্নার সওদা বাদ দিতে হবে। দু-একদিন উপবাসে আমার স্বাস্থ্য ভালো হবারই সম্ভাবনা। যাই হোক খাবারের চেয়ে কফি আমি পছন্দ করি, সুতরাং আমার লাভই হচ্ছে বলতে হবে। জেলের বেয়াড়া বিধি-ব্যবস্থাতেই শুধু মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরে যায়।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

আবার সোমবার! প্যারেডের দিন যেন বেশি তাড়াতাড়ি ঘুরে আসে, কিন্তু ক্যালেণ্ডার দেখলে বেশি দিন এগিয়েছি মনে হয় না। আজ সন্ধ্যায় 'লক্-আপের' কিছু আগে মেট্রন আমার সঙ্গে উঠানে

বেড়াতে বেড়াতে রাশিয়ার গেরিলাদলের একটি মেয়ের বীরত্বের কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিল। যে-ভাবে সে-মেয়েটি টেলিগ্রাফের তার কেটে রেলের লাইন নষ্ট করে কয়েকটা ছোটখাট স্টেশান প্রভৃতি পুড়িয়ে দিয়েছে তাতে মেট্রনের মনে তার ওপর রীতিমতো শ্রদ্ধা হয়েছে। তার গল্পের শেষে আমি ধীরে ধীরে না বলে পারলাম না, "জানকীর বিরুদ্ধে এই ধরনের কয়েকটা নালিশই আছে। শুধু এ-দেশের বিদেশী সরকারের ভাষায় তার নাম আগুন-দেওয়া, রাজদ্রোহ —বীরত্ব নয়। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলেও এ-সবের জন্য আমাদের সাতবছর জেল হয়।" এরপর আলাপ যে আর জমল না তা বলাই বাহুল্য।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

কাল রাত্রে ছাদ থেকে অনেক কিছু আমার গায়ে খসে পড়ে আমার ঘুম নষ্ট করেছে। প্রত্যেক বার উঠে উঠে বিছানা-কাপড় সব ঝাড়তে হয়েছে। রাত প্রায় আড়াইটার সময় লেখা চীৎকার করে

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। ছাদ থেকে একটা বড় বাদুড় একেবারে তার বুকের ওপর পড়েছে। বিছানা থেকে সেটা তাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সেটা ঘরময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভয় যা পেয়েছিলাম তাতে, তারপর আর ঘুমনো অসম্ভব। কে বলে কারাজীবনে উত্তেজনার খোরাক নেই ?

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

একজন আমাদের একতোড়া জিনিয়া ফুল আজ পাঠিয়েছে। এই নীরস জায়গাতেও কয়েকটা রঙিন ফুলে কতখানি তফাৎ যে হয়ে যায় ভাবলে অবাক হতে হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

কাল 'লক্-আপে'র আধ ঘণ্টা পরে বাইরের গেটে ধাক্কাধাক্কির শব্দ। মেট্রন উত্তেজিতভাবে এসে বললে, "মিসেস ইন্দিরা এসেছেন।" মিনিট খানেক

বাদেই আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে ইন্দু এসে হাজির। মেয়েরা হলেন রামকালী দেবী, মহাদেবী চৌবে, লক্ষ্মীবাই বাপৎ, বিদ্যাবতী ও গোবিন্দি দেবী। জানা গেল যে মেয়েরা একটা সভা করার আয়োজন করে কিন্তু সভা আরম্ভ করার আগে পুলিশ এসে ইন্দু ও আর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে যায়। তাতে পুলিশ ও জনতার মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। টানা-হেঁচড়ায় ইন্দুর গা-টা ছড়ে গেছে, কাপড়ও ছিঁড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ফিরোজও গ্রেপ্তার হয়েছে। ব্যারাকে দারুণ চাঞ্চল্য। ইন্দুকে আমাদের কাছে রেখে আর সকলকে ওধারের ব্যারাকে রাখা হল। আমরা শান্ত হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ তাদের উত্তেজিত আলাপ শোনা গেল।

ভাই-এর (জওহরলাল) কোনো খবর ইন্দুও পায়নি শুনে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে। বাপুর যেটুকু খবর সে জানে তাও ভালো নয়।

রঞ্জিত অত্যন্ত অসুস্থ, বম্বে ছেড়ে আসতে পারেননি।

এলাহাবাদে ফিরে আসবার আগে তিনি দশদিন 'খালি'তে থেকে আসবেন ঠিক করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার দারুণ ভাবনা হচ্ছে। তাঁর যত্ন তদারক করা বড় বেশি দরকার।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

সেই বৃদ্ধা মারাঠী মহিলাকে নিয়ে আমাদের সকলকেই বেশ একটু দুর্ভোগ পোয়াতে হবে দেখছি। আগেই ১৯৩২ সালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তখন আমাদের পথ ছিল আলাদা। বিচারের পর আমাকে লক্ষ্ণৌ পাঠান হয়েছিল, তিনি গিয়েছিলেন ফতেগড়ে। এবারে মনে হচ্ছে তিনি আমাদের সঙ্গেই বরাবর থাকছেন। ভগবান যেন আমাদের সহায় হন! তিনি প্রতিদিন সকালে বিকালে উচ্চ কাংস্য কণ্ঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গীতা আবৃত্তি করেন ও বাকি সময়টা কাটান সবাইকার কাছে মহারাষ্ট্র ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা বর্ণনা করে। তাঁর বয়স প্রায় ষাটের ওপর।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

আজকের দিনটা আবার খুব গরম ছিল, বোধ হয় এ-পর্যন্ত সব চেয়ে গরম। আমি তিনবার স্নান করেছি, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। গত দু'দিন ধরে কিছুই প্রায় খেতে পারিনি। এতে বড় বিশ্রী লাগে, মাসের প্রতিদিন ওষুধ গিলতেও পারি না। ইন্দুর জ্বর হচ্ছে, ওকে মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। জানতে পারলাম যে বিদ্যাবতী সন্তানসম্ভবা আর গোবিন্দির বয়স মোটে বারো। দুজনকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। শুধু একবার একটা সভায় গিয়েছিল, এই অপরাধে, নেহাৎ একটি বালিকা আর গর্ভবতী একটি অত্যন্ত অল্পবয়সী মেয়েকে জেলে দেওয়া সত্যিই হাস্যকর। এই গভর্নমেণ্ট কোথায় এখন নেমেছে!

আজ সন্ধ্যায় শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিয়েছে। ওধারের ব্যারাকটার ওপর সুন্দর একটা রুপোর কাস্তের মতো চাঁদ ঝুলে আছে। ইন্দু, লেখা ও আমি কাজ-কর্মের একটা ব্যবস্থা ঠিক করেছি। দুপুরের রান্নাটা আমি রাঁধব, আর ওরা রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা

করবে। সকালে চা ছাড়া আমরা কিছু খাই না, সুতরাং বিশেষ কিছু করবার নেই।

মেয়েরা খুব বেশি রকম পড়াশোনা করবে বলে মতলব করছে। ইন্দু লেখাকে ফ্রেঞ্চ পড়ায় সাহায্য করবে। লেখাও তার বইগুলো আনাবার অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছে, যাতে সে পড়াশোনা করে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে পারে। চেয়ার টেবিল কিছু আমাদের নেই, সুতরাং পড়াশোনার একটু অসুবিধে হবে। সেদিন একটা চেয়ার চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু শুনলাম জেলের মালগুদামে কোনো চেয়ার নেই। সওদা রাখবার জন্যে চেয়ারের চেয়েও একটা মিটসেফ আমাদের বিশেষ দরকার। আমাদের চিনি পিঁপড়ের হাত থেকে বাঁচান দায়, বেড়ালে দুধ খেয়ে যায়।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

লরেন্স হাউসম্যানের আত্মজীবনী 'দি আনএক্সপেক্টেড্ ইয়ারস্' পড়ছিলাম। তাঁর স্কুলের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "আমাদের সময় পাবলিক স্কুলের

শিক্ষা-পদ্ধতি যা ছিল, তা সমর্থন করে যাঁরা সেই পদ্ধতি চালু রাখতে চান, তাঁদের মতে জোর-জুলুম সওয়াটা ছোট ছেলেদের পক্ষে ভালো, এতে তাদের চরিত্র দৃঢ় হয়। হয়তো তাই হয়, কিন্তু জোর-জুলুম যারা করে তাদের এতে কি হয়? আমার তখনই মনে হয়েছে যে সবলের পক্ষে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাপুরুষতা। আমাদের পাবলিক স্কুলে দুর্বলের ওপর জুলুম করা ও তাদের বেগার খাটানোর যে রেওয়াজ চলে আসছে, আমার ধারণা সাম্রাজ্যবাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকারে দম্ভভরে পৃথিবীময় পরাধীন জাতিদের উপকার করবার ছুতোয় শোষণ করার তাই থেকেই সূত্রপাত।”

আর একজায়গায় তিনি বলেছেন: “ডেল্‌ফির মন্দিরে একটি মূল্যবান গ্রীক প্রবাদ উৎকীর্ণ আছে, ‘কাউকে যদি চিনতে চাও তাকে ক্ষমতা’ দাও। কথাটা কতখানি সত্য আমার স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকে ছেলে-বেলাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। যে-ধরনের ক্ষমতাকে ‘উদার একাধিপত্য’ বলে তার অনুরাগীরা

বর্ণনা করে, তার প্রয়োগ যেখানেই হয়েছে, সেখানেই ক্ষমতাবানের চরিত্রের ভালো-মন্দ দুদিকই সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেতে আমি দেখেছি। যাদের ওপর এ-ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় ও এ-ক্ষমতা প্রয়োগ যে করে, উভয়েরই নৈতিক ও মানসিক অধঃপতনের দৃষ্টান্ত প্রায় সার্বজনীন বললেই হয়। এ-ভার বইবার যোগ্য মানব-প্রকৃতি একান্ত বিরল বলেই আমি মনে করি। মানব জাতির মধ্যে আদিম নিষ্ঠুরতা এমন বদ্ধমূল যে অতিবড় সাধু মহাপুরুষদেরও অন্য সকলের জীবনের ওপর অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না…”

একথার ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

ক্রমশঃই আমার এই ধারণা হচ্ছে যে আমি একটি সমাজবিরোধী জীব। আশপাশের মানুষকে যতই আমি দেখছি ততই আমার মন নির্জনতার দিকে ঝুঁকছে! যে দু'হপ্তা আমি এখানে একলা ছিলাম,

বাচ্চাদের ও বাইরের ঘটনার সম্বন্ধে ভাবনা থাকার দরুন এবং জেলের জীবনের সঙ্গে তখনো খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি বলে, মাঝে মাঝে আমার অবশ্য খুব একা মনে হতো। এ-সব গোলমাল কিন্তু ধীরে ধীরে সব কেটে যেত। আগে মাসের পর মাস আমি একলা জেলে কাটিয়েছি, কখনো কোনো সঙ্গীর দরকার বোধ করিনি।

গত কয়েকদিন এত গোলমাল গেছে যে, দুটো কথা ভাববার সুযোগও যেন পাওয়া যায়নি। পড়াশোনা তো অসম্ভব হয়ে উঠেছে, আমার স্নায়ুগুলো যেন সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এতেই যেন যথেষ্ট নয় বলে নতুন আদেশ জারি হয়েছে এই যে, সারা-রাত সমস্ত কয়েদীদের প্রতি পনর মিনিট অন্তর যথা নিয়মে গুন্তি করা হবে। তার মানে সেই বিশ্রী গোলমালে আমাদের ঘুম আর হবে না। সত্যি জেলের কর্মচারীদের কার্যকলাপ সমস্ত বিচারবুদ্ধির বাইরে।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

আজ সকালে ছ'টায় রঞ্জিত আনন্দ-ভবনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত পর্শু দিন রাত্রে তিনি বম্বে থেকে ফিরেছেন। বেচারী তারা ও রিতা! আশা করছিলাম অন্ততঃ একহপ্তা তারা তাদের বাপের সঙ্গে থাকতে পাবে। কিন্তু আজকালকার দিনে, মানুষ ভাবে এক আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট করে আর এক।

ফিরোজের এক বছর সশ্রম কারাবাস ও দু'শো টাকা জরিমানা হয়েছে। আমি নিজে অন্ততঃ এমন অনিশ্চিত শূন্যে ঝুলে থাকার চেয়ে আমার জেলের মেয়াদ কতদিন, ঠিকমতো জানতে পারলে খুশি হতাম। তবে নিজে বা আর কারো জেলের মেয়াদের দৈর্ঘ্য নিয়েও কখনো বেশি মাথা ঘামাই না।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

আজ সকালে সুপারিনটেনডেণ্ট হঠাৎ বললেন, আমায় কফি দেওয়ার তাঁর কোনো অধিকার নেই। আইনের নজীর দেখিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে

নিয়ম না থাকলেও তাঁরা আমার খাতির করবার চেষ্টা করছেন। আমি অত্যন্ত রেগে উঠে বললাম, কোনো অনুগ্রহ আমি চাই না, কফি তাঁরা ফিরিয়ে নিতে পারেন। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে টিনটা আমি সুপারিনটেনডেণ্টের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। পরে আমায় জানান হল যে চায়ের বদলে কফি আমি কিনতে পারি, কোনো রকম অসুবিধে হবে না।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

লেখা কাল সারারাত ছটফট করেছে। ফোড়াগুলোর ফাটবার কোনো লক্ষণ নেই। যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি, ওকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর জ্বর সেই নিরানব্বুই থেকে একশো পর্যন্ত আছে।

ইন্দুকে কাল রাত্রে বাইরে শোবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার খুব কষ্ট হয়েছে। বারান্দায় তার বিছানা করা হয়েছিল কিন্তু রাত্রে বাতাস আসে অন্য দিক থেকে। যখন

একথা মনে পড়ল তখন আর বিছানা সরাবার উপায় নেই।

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ কেন যে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করলাম তার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আটটার সময় বসে থাকতেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। লেখার হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েই আমি শুয়ে পড়লাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট খুব গভীরভাবে ঘুমিয়েছি। কাল বেশ ঠাণ্ডা ছিল, মশাও ছিল খুব কম। তবুও রাত্রে আর ভালো করে ঘুম হয়নি। আজ সকালে একটু ভালো বোধ করছি, যদিও এখনো শরীরটা বিশেষ ঝরঝরে হয়নি।

লেখার ফোড়া আরো বড় হয়েছে, ওপরের চামড়াটা উঠে গিয়ে একটা ছোট মুখও দেখা যাচ্ছে। তবে এরকম আগেও একবার হয়েছিল—ফোড়াটা ফাটার কোনো লক্ষণই নেই। আমি তো এটা নিয়ে হয়রান হয়ে গেছি, লেখাও বোধহয় একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছে। তবু ধৈর্য তার অসীম।

ইন্দুর রাতটা কাল একটু ভালো কেটেছে। কাল সে ভেতরেই শুয়েছিল, তবে রাতটা ছিল ঠাণ্ডা তার ঘুমও মন্দ হয়নি।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

সবই যথাপূর্বম্। দিনগুলো এমন একঘেয়ে যে মনে হয় সময় যেন অচল হয়ে আছে। লেখার ফোড়াটাতেও যেন জেলের হাওয়া লেগেছে—তার আর বাড়বার নাম নেই। ইন্দু কাল থেকে অনেকটা ভালো আছে, তাকে দেখাচ্ছেও ভালো। সকালে বিকালে তার শরীরের তাপ থাকে ৯৯·২। কোনো দিন ক্লান্ত থাকলে বা যন্ত্রণা হলে দু'চার পয়েন্ট বাড়ে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

শুনলাম, ফিরোজকে আরো শতাধিক লোকের সঙ্গে এখানে এনে 'সি' ক্লাশে রাখা হয়েছে। এ-খবরে মন চঞ্চল হবারই কথা। ইন্দুকে স্বাস্থ্যের খাতিরে ছেড়ে দেওয়ার কথা হয়েছে শুনছি। তার জ্বর সেই রকমই চলছে।

আজ থেকে সোমবারের উপবাস শুরু করব ঠিক করেছিলাম কিন্তু গত কাল থেকে এত দুর্বল বোধ করছি যে আর কিছু দিন অপেক্ষা করাই ভালো মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে সকলেরই যেন সর্দি লেগেছে। হাঁচি ও কাশি আমার চারদিকেই শুনতে পাচ্ছি। কতদিন আমি রেহাই পাব ভাবছি। শীতে এ-ব্যারাক জমে যায়, গরমে ঠিক একটা উনুন হয়ে ওঠে—কি সুখেরই জায়গা! জেল কারা তৈরি করে?

সূচিভেদ্য অন্ধকারের রাত। বাইরের দেওয়ালটার চেহারাটা পর্যন্ত টের পাচ্ছি না—রাত্রে সেটা আরো ভীষণ ও বিরাট দেখায়। মনে হচ্ছে বাইরের উঠানটা যাতে আমরা না দেখতে পাই তার জন্যে আমাদের সামনে একটা কালো মখমলের পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক দিন পুরুষদের জেলে নতুন নতুন আরো অনেক রাজনৈতিক কয়েদী আসছে। বাইরে পুলিশের লরির থামার শব্দ আমরা শুনতে পাই, তারপর

উচ্চকণ্ঠে স্বদেশী বাণী শুনে বুঝি আমাদেরই আপনার জনদের আনা হচ্ছে। কখনো কখনো আমাদের উঠানের অন্যদিকে ছেলেদের বেত মারার শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছি। একটু কায়দা করে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি এ-ধরনের ঘটনা বিরল নয়। দলে দলে ছাত্রদের ধরা হয় এবং তাদের অনেককে বেত মেরে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেলেদের অনেকে একেবারে শিশু—হয়তো কোনো মিছিলে যোগ দিয়েছিল বা কোনো সভায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১লা অক্টোবর ১৯৪২

সুন্দর ঝলমলে সকাল। রাতটা আমার ভালো কেটেছে, অনেকদিন শরীরটা এত চাঙ্গা মনে হয়নি। মুন্সি আর ছোট্ট শাক্কো প্রায় দশদিন হল অসুখে পড়ে আছে। আজ অনেক আন্দোলন করে জেলের বড় ডাক্তারকে দিয়ে তাদের পরীক্ষা করাতে মেট্রনকে রাজী করানো গেল। বোঝা যাচ্ছে তাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সামান্য ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই

করা হয়নি। শাকোর অবস্থা খুব খারাপ, কোনো পথ্যিও সে পায়নি। কয়েদী আর তাদের ছেলে-পুলেদের কি ভাবে যে উপেক্ষা করা হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। জেলে সত্যিকারের অসুস্থ হওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি মানুষের আর হতে পারে বলে মনে হয়না।

সেই বৃদ্ধা মারাঠী মহিলা—লক্ষ্মীবাই বাপৎ, এখানে এসেছেন। বিচারাধীন হয়ে এখন তিনি 'সি' ক্লাশে আছেন। বিধাতা আমাদের সহায়!

২রা অক্টোবর ১৯৪২

আজ বাপুর চতুঃসপ্ততি জন্মদিন।

৩রা অক্টোবর ১৯৪২

সকাল ও রাতগুলো ক্রমশঃ বেশ আরামের হয়ে উঠছে। আজ এখন এই বেলা এগারটাতেও বেশ ভালোই লাগছে বলতে হবে।

লেখার ফোড়াটা মনে হচ্ছে একেবারেই সেরে গেছে। শুধু একটু গুটি বেঁধে আছে। তাতে

আইয়োডিনের মলম লাগাচ্ছি। যন্ত্রণা এখন আর কিছু নেই। এখন তাই নিয়মিতভাবে কিছু কিছু পড়াশোনা ও ব্যায়াম সে করতে পারছে।

দু'দিন আগে ঠিক 'লক্-আপে'র আগে একটি অল্প-বয়সী মেয়েকে এখানে আনা হয়, দু'মাসের একটি বাচ্চা তার কোলে। সে 'সি' ক্লাশের বিচারাধীন কয়েদী। তার একমাত্র অপরাধ—রাস্তা দিয়ে একটি পতাকা নিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল। দশদিন আগে কংগ্রেস ইস্তাহার বিলি করবার জন্যে তার স্বামী ধরা পড়ে। তার মতো এমন অসহায় আপন-ভোলা মেয়ে আমি কখনো দেখিনি। তার চারধারে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই সে জানে না, বাচ্চাটার পর্যন্ত তদারক করবার ক্ষমতা নেই। অথচ এই নিয়ে তার সন্তান হয়েছে তিনটি।

এক এক সময় জীবন আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হয়—শুধু বিরাট একটা জিজ্ঞাসা 'কেন'—যার কোনো উত্তর নেই।

৪ঠা অক্টোবর ১৯৪২

গতকাল ডাক্তার আমায় জানিয়েছেন যে ইন্দিরা, লেখা ও আমাকে 'এ' ক্লাশে ফেলা হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা বারো আনা করে বরাদ্দ পাব। রঞ্জিত ও ডাক্তার কাটজুকেও এই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। ডাক্তার আর কিছু বলেননি, তাই কিসের ওপর এই শ্রেণী বিভাগ হয়েছে, কি কি সুবিধেই বা এতে আছে আমরা জানি না। যাই হোক ব্যাপারটা অন্যায় বলে আমি মনে করি এবং বিস্তারিত বিবরণ না-জানা পর্যন্ত অতিরিক্ত পয়সাও নিতে পারি না। সুপারিনটেনডেণ্টকেও সেই কথাই আমি লিখে দিয়েছি। কাল প্যারেডের দিন হয়তো সব জানতে পারব।

৫ই অক্টোবর ১৯৪২

কাল রাত্রে দারুন এক চাঞ্চল্য। রাত প্রায় দুটোর সময় জোহরার চীৎকারে আমি চমকে জেগে উঠলাম। জোহরা আমার সামনের গরাদগুলোর ভিতর দিয়ে

চেঁচিয়ে বলছে যে কনট্রোল পাহারার কাছে একটা সাপ রয়েছে, তাই সেটা পেরিয়ে যেতে পারছে না। প্রথমে বিছানা ছাড়বার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রমশঃ জোহরার উত্তেজনার ছোঁয়াচ আমারও গায় লাগল। উঠে পড়ে টর্চ জ্বেলে দেখি ঠিক আমার বিছানার উল্‌টোদিকে ব্যারাকের বাইরের দেয়ালে, হাত দুয়েক লম্বা সরু ছাই-রঙা বিষাক্ত একটা সাপ। পাহারায় যে সিপাই আছে তাকে জানাবার কথা বললাম, সে যাতে এসে সাপটা মেরে ফেলে। কিন্তু ওয়ার্ডারনী দুজনেরই অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও মেট্রনকে জানিয়ে সে কিছু করতে রাজী হল না। সাপটা তিনটে থেকে পৌনে চারটে পর্যন্ত সেইখানেই রইল। কিন্তু ওয়ার্ডারনীরা ভয়ে তার কাছে এগুলো না, পাহারাদার সেপাই কিছু করা প্রয়োজনই মনে করল না। আমরা তালা বন্ধ হয়ে আছি সুতরাং আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভবই নয়। শেষ পর্যন্ত সাপটাকে আর দেখা গেল না। আমার গরাদগুলোর ফাঁক দিয়ে খুব সামান্যই দেখা যায় সুতরাং সেটা

কোথায় গেল বলতে পারি না। কাউকে যদি হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে কামড়ায় তাহলে কি হবে তাই ভাবছি। ওয়ার্ডারনী ও পাহারাদার যতক্ষণে ব্যাপারটা জানাতে রাজী হবে, যতক্ষণে মেট্রন জেগে উঠে প্রধান গেট থেকে চাবি নিয়ে এসে মেয়েদের মহল খুলবে, ততক্ষণ সাপ যাকে কামড়াবে তার বোধহয় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে গেছে। ভাবলে সত্যি যথেষ্ট সান্ত্বনা পাওয়া যায়!

৬ই অক্টোবর ১৯৪২

আজ সকালের শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশ মিষ্টি। খানিকক্ষণ আমায় গরম ড্রেসিংগাউনটা পরে থাকতে হয়েছিল।

কাল থেকে বেশির ভাগ সময় আমার রাজনৈতিক শিশুটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে আর তার জন্যে জামা-কাপড় সেলাই করতেই কেটে গেছে। তার গায়ে ক'পুরু যে ময়লা ছিল কি বলব। কি করে যে কোনো মেয়ে তার বাচ্চার এমন দুরবস্থা করতে পারে ভেবে পাই না।

রঞ্জিত আমাদের কতকগুলো ফুলের গুছি ও কয়েকটা চারা পাঠিয়ে দিয়েছেন। গত বছর তাঁর ব্যারাকে যে বাগান তিনি শুরু করেছিলেন সেটা এখনো ভালো ভাবেই আছে। গতবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার সময় তিনি চমৎকার একরাশ ন্যাস্টারশিয়াম ফুল এনেছিলেন। আমাদের উঠানের মাটি বড় কাঁকরভরা, তাই মেট্রন আমাদের কয়েকটা ফুলের টব ও বাক্স, বীজগুলো পোঁতবার জন্যে দেবে বলেছে। মেয়েদের উৎসাহের সীমা নেই। গত কয়েকদিন জেলে বেশ কিছু কাঁদাকাটি ও মনমরা ভাব দেখা গেছে। কারণ মেট্রনের নেকনজর এক কয়েদী-আর্দালীর ওপর থেকে আর একজনের ওপর পড়েছে। এই ধরনের ব্যাপারে আমি বড় অবাক হয়ে যাই। কয়েক মাস ধরে মেট্রন একজন কয়েদী-আর্দালীর ওপর এতখানি প্রসন্ন থাকে যে, কয়েদীদের ব্যাপারে তার ওপরে কারুর কথাই চলে না; সে মেট্রনের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করে, আর তার বদলে উপরি খাবার, তামাক, দু'চারটে পোশাক, এমনি কি পয়সা

পর্যন্ত পায়। যদিও পয়সার ব্যাপারটা আমাদের জানবার কথা নয়। তারপর হঠাৎ কি কারণে বোঝা যায় না, মেট্রনের সুনজর তাকে ছেড়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর গিয়ে পড়ে। এতে শুধু ঝগড়াঝাঁটি ও অশান্তিই বাড়ে না, জেলের ভিতরকার সমস্ত ষড়যন্ত্রের এই থেকেই সূত্রপাত।

৭ই অক্টোবর ১৯৪২

সকালের দিকে আজ এত ঠাণ্ডা ছিল যে, আমরা সবাই কম্বল গায়ে দিতে পারলে খুশি হতাম। আমার পাতলা শালটা সে-শীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই কোনো রকমে কুণ্ডলী পাকিয়ে আমায় পাগুলো গরম রাখতে হয়েছে।

জেলের ভাষায় যাকে বলে 'জাণ্ডেলী', সেই আই. জি. পি.-র বার্ষিক জেল-পরিদর্শনের সম্ভাবনায় আজকে সমস্ত জেলের ঝাড়পোঁছ চলেছে। আই. জি. কি কাজে এলাহাবাদে কাল এসেছেন এবং মর্জি হলে যে-কোনো মুহূর্তে এখানে আসতে

পারেন। সত্যি কথা বলতে গেলে এ-জেলের বেশ কিছু ঝাড়পোঁছ দরকার। এখানকার মতো আমাদের মহলের এমন নোংরা অবস্থা আগে কখনো দেখিনি। আগে যে মেট্রন ছিল তার একটা গুণ ছিল এই যে ধুলো-ময়লা সে মোটে দেখতে পারত না। সমস্তই তখন নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার রাখা হতো। চারদিক থেকে আমাদের ব্যারাকটা এমন তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ছে যে সেটা পরিষ্কার রাখা একটু শক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যারাকই তখন যথাসম্ভব ঝকঝকে তকতকে থাকত; হপ্তায় দু'বার গরাদগুলো পালিশ করা ও ছাদের কড়িগুলো পরিষ্কার করা হতো। এখন যে যা-খুশি করে, কেউ নজরও রাখে না। কখনো-সখনো আমি নারাণীকে ছাদে তুলে দিই। ঝুল ও ধুলো সে পরিষ্কার করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা আবার যে কে সেই।

ব্যারাকে ইঁদুরগুলো অত্যন্ত বাড়ছে, তাদের উপদ্রবে আমরা অস্থির। তবে ব্যাঙগুলো শেষ পর্যন্ত বিদায় নিয়ে গেছে। আজ সকালে যামিনী নামে ছোট

মেয়েটি স্কুল থেকে ফিরে তার মায়ের কাছে দৌড়ে যাচ্ছিল। ওয়ার্ডারনী তাকে থামিয়ে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল সে দোক্তা চাইতে এসেছে। ওইটুকু মেয়ে হলে কি হয়, সে ও তার দলের সবাই, এমন কি তার চেয়ে যারা ছোট তারাও এমন নেশাখোর হয়ে উঠেছে যে, দোক্তা ছাড়া একদিনও থাকতে পারে না! সত্যিই ভয়ানক কথা! মনে হয় যেন মেট্রনের এ-ব্যাপার বন্ধ করবার কোনো ক্ষমতাই নেই। তিন বছর বয়স থেকেই এদের সকলের দাঁত খারাপ—সবাই একেবারে পাঁড় নেশাখোর বলা যায়। বড়ই লজ্জার কথা। আসল দোষ হল এই যে কোনোরকম শাসনের বালাই এখানে নেই। মেট্রন জানে যে প্রত্যেক মেয়ের কাছেই লুকানো পয়সা থাকে। ওয়ার্ডারনীদের মারফত তাই দিয়ে যে তারা দোক্তা ও অন্যান্য জিনিস কেনে এবং তাদের সাবান ও তেলের বদলে তারা যে দোক্তা-সুপারী নেয় মেট্রনের তাও অজানা নয়। তবু কোনো ব্যবস্থাই করা হয় না। কিছু যে

করা হবে না কয়েদীরাও তা জানে এবং সেই মতোই তারা চলে। যে-সব বিকৃতি যৌন আচার এখানে চলে সে-সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ-সব ব্যাপারে ওয়ার্ডারনীরাই সব চেয়ে দোষী, সর্বপ্রকারে তারা এতে সাহায্য করে। এ-সব কাজে উপযুক্ত লোক যতদিন না নেওয়া হবে এবং মেট্রন যতদিন না তার কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য হবে ততদিন সত্যিকার কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না।

বাড়ি থেকে তিনটি নতুন বই এসেছে—লিন-ইউ-টাঙ-এর নতুন উপন্যাস, 'এ লিফ্ ইন্ দি স্টর্ম' ও আরো দুখানা।

৮ই অক্টোবর ১৯৪২

ইনস্পেক্টর জেনারেল আজ বেলা তিনটার সময় এসে হাজির। সব শুদ্ধ আমাদের ব্যারাকে তিনি ঠিক সাড়ে তিনটি মিনিট ছিলেন। মনে হল তিনি বেশ খোসমেজাজে আছেন। দু'বার খুব জোর দিয়ে

বললেন, "সবাই ভালো আছ জেনে আমি খুশি।" তিনি চলে যাবার পর জেল যেন গা এলিয়ে দিলে। মেট্রন ক্লান্ত হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। মিসেস বোথাজুর খিদে পেয়েছিল, পুরানো গল্প বলবার ঝোঁকও ছিল একটু, এক কাপ চা ও এক টুকরো রুটির বিনিময়ে সে আমাদের তার জীবনের অনেক গল্প শোনালে। জেলখানার গোয়ালে কোনো একটা গোলমাল হয়েছে, সাড়ে ছ'টার আগে তাই দুধ এসে পৌঁছল না। 'তালা বন্ধ' হতেও তাই দেরি হয়ে গেল। ক্রমশঃই বেলাবেলি সন্ধ্যা হতে শুরু করেছে। 'লক্‌-আপ'-এর আগের আধ ঘণ্টাটি ভারি মনোরম।

কয়েকদিন ধরে মার্কিন প্লেনগুলো তাদের টহলদারির অঙ্গ হিসেবে আমাদের জেলের ওপর চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। টহল দিতে তারা গয়া পর্যন্ত যায় শুনলাম। রাত্রে প্লেনগুলো বড় সুন্দর দেখায়—তারাগুলির মাঝে যেন উল্কা। অত উঁচু থেকেও তাদের লাল ও সবুজ আলোগুলো ঠিক মণির মতো জ্বলজ্বল করে।

৯ই অক্টোবর ১৯৪২

রাতটা ভালো কেটেছে। মেট্রন বললে, কাল আমাকে ও লেখাকে রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছি। বম্বে ছাড়বার আগেই এই সাক্ষাতের জন্যে রঞ্জিত আবেদন করেছিলেন। যান্ত্রিক সরকারী পরিচালনা রসিকতা কাকে বলে তাও বোঝে না! যাই হোক কাল যে দেখা করতে পাব তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ।

১০ই অক্টোবর ১৯৪২

লেখা ও আমি রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর পায়ের সেই অসুখটা সত্ত্বেও চেহারা বেশ ভালোই দেখাচ্ছে মনে হল। অনেক দিন বাদে দেখা, বড় ভালো লাগল। কিন্তু জেলখানার দেখা হওয়া এমন যে মন তাতে ভরতেই পারে না।

১১ই অক্টোবর ১৯৪২

কাল রাত্রে ওধারের ব্যারাকে ভগওয়ান দেই আর নারাণীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে

ঝগড়াটা আরম্ভ কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই তা নিদারুণ হয়ে ওঠে। দুজনের গলা তো সপ্তমে ওঠেই, তার ওপর অত্যন্ত কুৎসিত জঘন্য গালাগালিতে বাতাস পর্যন্ত যেন বিষিয়ে যায়। এ-রকম বিশ্রী ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মেট্রনের কাছে এ-ব্যাপার জানতে বাধ্য হয়েছি, এবং তাকে বলেছি যে এখন থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যারাকে মাত্র একজন করে সাধারণ দাগী কয়েদী যেন রাখা হয়। ভগওয়ান দেই যখন কয়েদীদের আর্দালী তখন আর একজন সাধারণ কয়েদী নারাণীর সেখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। সাধারণতঃ নারাণী ঝগড়া শুরু করে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই জব্দ হয়।

কাল রাত্রে পুরুষদের জেল থেকে একজন পালাবার চেষ্টা করে। বেচারার পাঁচ বছরের জেলের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, আর দু'মাস বাদেই ছাড়া পেত। লোকটার যক্ষ্মা হয়েছে। বোধহয় বিচারে ওর আরো একবছরের জেল হবে।

১২ই অক্টোবর ১৯৪২

ঈদ্ বলে আজ আর 'প্যারেড' হয়নি, কাল উই পোকায় আমাদের ফলের ঝুড়িটা কেটে আধখানা আপেল ও খানিকটা বাতাবী লেবু সাবাড় করে দিয়েছে।

১৩ই অক্টোবর ১৯৪২

রাজনৈতিক বন্দী শিশুটি দিন দিন ভারি মিষ্টি হয়ে উঠেছে। মেয়েটা জেলে দিব্য আছে। আমাদের জীবনের ও একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে বলা যায়। ওর মা ছাড়া পেলে সত্যি ওর জন্যে মন কেমন করবে।

১৪ই অক্টোবর ১৯৪২

রঞ্জিতকে কয়েকটা বই পাঠিয়েছি। দেওয়ালের ঠিক ওপাশেই কোনোখানে তিনি আছেন, তবু কতদূরে! তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে এত ইচ্ছে করে। আমার হাতে নিউরাইটিস্ হয়ে আমার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা এমন হয়েছে যে লজ্জাকরই বলা যায়। তাই বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে, আমার

দুটো শাড়ি জেলের ধোপার কাছে পাঠান হয়েছিল। আজ দশদিন ধরে সেগুলো তার কাছেই আছে। যে-দুটো আমি পরি কফির মতো সেগুলোর রঙ হয়েছে, হাজার কাচলেও সেগুলো শাদা করতে পারি না। জেলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ের অভাব আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে। যত সাবানই দিই না কেন, কাপড়-চোপড় একবারে শাদা কিছুতেই হয় না। সুতরাং জেলে কখনো শাদা পোশাক পরা উচিত নয়।

১৫ই অক্টোবর ১৯৪২

যথাপূর্বম্ জীবন চলেছে। বেচারা লেখার ডান বগলের তলায় আবার পাঁচটা শক্ত ঢেলারমতো ফোড়া দেখা দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু যন্ত্রণা হয়নি কিন্তু ফোড়াগুলো বাড়তে পারে। জেলের চিকিৎসায় কোনো বিশ্বাস আর আমার নেই, অসুখ-বিসুখ তাতে খুব কমই সারে। আজ সকালে বিলাসো-মাই বললে যে ফোড়াগুলোর ধারে ধারে

একটু মালিশ করলে উপকার হতে পারে। লেখা রাজী হয়ে তাই করিয়েছে। ভালো হবে কিনা জানি না, তবে বিলাসো একাজে পাকা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বিলাসো-মাই' এক হিসেবে বড় অদ্ভুত এক বুড়ি। সে এখানকার একজন ওয়ার্ডারনী, আট বছর ধরে এখানে আছে। মুখখানি ভারি মিষ্টি, মাথায় শাদা পাকা চুল, ঝুঁটি করে বাঁধা এমনিতে দেখলে খুব শান্ত চুপচাপ মনে হয়, তবে যাদের ওর ভালো লাগে তাদের কাছে খুব প্রাণ খুলে স্ফূর্তির সঙ্গে তাকে কথা কইতে আমি দেখেছি। মনটা তার উঁচু, সকলের সাহায্য করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। আমি প্রায়ই দেখি নিজের খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিসের ভাগ সে তার চেয়ে অবস্থা যাদের খারাপ তাদের কাউকে না কাউকে দিচ্ছে। জন্তু জানোয়ার সে অত্যন্ত ভালোবাসে। টিয়ার ছানা ও কাঠবেড়ালী ধরে সে পোষ মানায়।

রঞ্জিত কয়েকটা নতুন বই পাঠিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে বইগুলো খুব চমৎকার!

আজ আমাদের ওজন নেওয়া হল। এখানে আসা অবধি লেখার চার পাউণ্ড ও আমার ছ' পাউণ্ড ওজন কমেছে! ইন্দু যা ছিল ঠিক তাই আছে, তবে সেটা কিছু খুশি হবার মতো কথা নয়, কারণ এমনিতেই তার ওজন যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম; আর কিছু কমে যাওয়া তার পক্ষে ভালো নয়।

১৬ই অক্টোবর ১৯৪২

আমার ওজন কমে যাওয়াটায় একটু ভাবিত হয়েছি। ঠিক করেছি এখন থেকে রাত্রে কিছু খাব। দুধ খাওয়ার খরচ আমি কুলোতে পারব না, কারণ আমার দৈনিক বরাদ্দ (ন'আনা) সবই আমার খরচ হয়ে যায়। এই বরাদ্দ থেকেও ব্যারাকের অনেক অভাব মেটাতে হয়, তাই কোনো রকমে কষ্টেস্থষ্টে এতে চলে। মেট্রন আমায় বললে যে আরও তিনজনকে বারো আনা বরাদ্দের স্তরে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে তোলা হয়েছে। ট্যাণ্ডনজী, রায় অমরনাথ ও পূর্ণিমা।

কাল বিকেলে লিন-ইউ-টাঙ-এর নতুন বইটার বিষয় আলোচনা করতে করতে লেখা বললে যে ছেলেবেলায় সে বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সে-ধরনের বাণী সম্বন্ধে যথেষ্ট তার শ্রদ্ধা থাকলেও সে আবার পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এসেছে! আর যাই হোক আমার মেয়েরা কিন্তু বেশ মজার!

১৭ই অক্টোবর ১৯৪২

রামকালীর ছোট ছেলে ছাড়া পেয়েছে—তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। রামকালী তার জন্যে বিশেষ চিন্তিত ছিল। এ-খবর পেয়ে খুব স্বস্তি পেয়েছে।

১৮ই অক্টোবর ১৯৪২—বিজয়া দশমী

দশেহ্‌রা উপলক্ষে আমরা ও-ব্যারাকের সবাইকে এখানে খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। অনুষ্ঠানটা ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। সেই 'সুপ্রাচীনা মহিলা' খুব ভালো মেজাজে ছিলেন। আমি তাঁর জন্যে খানিকটা দই এনে দেওয়ায় তিনি আরও বিশেষভাবে খুশি হন। তৎক্ষণাৎ তিনি সকলকে জানিয়ে দেন

যে কঙ্কন দেশে বিয়ে হয়েছে বলেই আমার বুদ্ধি বিবেচনা এত ভালো। তিনি নিজেও নাকি কঙ্কনেরই লোক, কিন্তু রঞ্জিতের বংশ পরিচয় কোথা থেকে তিনি খুঁজে বার করলেন ভেবে পাচ্ছি না।

কয়েদীরা দশেহ্‌রা অনুষ্ঠান করবার অনুমতি চায়। মেট্রন তাদের নাচ-গান করবার অনুমতি দিয়েছে। এদের মধ্যে এত গুণী ছিল দেখে আমি অবাক হয়েছি। অধিকাংশ নাচ-গানেই একটু ইতরতার আভাস অবশ্য আছে, থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকেরই গলা বেশ ভালো। বিলাসো-মাইকে যখন সবাই নাচতে বললে তখন আমি তো হতভম্ব। বয়স তার পঞ্চাশের ওপরে, এ-সব হাল্কা ব্যাপারে কোনো রুচি আছে বলে মনে হয় না। নাচল কিন্তু খুব চমৎকার। যৌবনে নিশ্চয় আরও ভালো পারত। 'ফলিস্‌ বার্জের'-এ (একটি ফরাসী নৃত্যশালা) তার যোগ দেওয়া উচিত ছিল। জেলে মিছিমিছি তার আখের মাটি হচ্ছে।

২২শে অক্টোবর ১৯৪২

সিভিল সার্জন আজ ইন্দিরাকে দেখতে এসেছিল। ইন্দিরাকে পরীক্ষা করে সরকারের কাছে তাকে ফলাফল জানাতে বলা হয়েছে।

আজ বিকালে আর একজন রাজনৈতিক কয়েদী এলেন। তিনি বরোখারের একজন কংগ্রেস-কর্মীর স্ত্রী। বরোখার রঞ্জিতের এলাকার মধ্যে পড়ে। তিনি আগেও এখানে এসেছেন। মেয়েটি হরিজন, ভারি ভালো, নাম দুবাসী। তালা বন্ধ করার আগে সেই প্রাচীন মহিলা যখন আবিষ্কার করলেন যে নতুন যে-মেয়েটি এসেছে সে তথাকথিত অস্পৃশ্য এবং তাঁর পাশেই তার বিছানা পড়বে তখন এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে। প্রাচীন মহিলার স্বরূপ এবার প্রকাশ হয়ে পড়ল। নিজেকে যে-ছদ্মবেশে তিনি ঢেকে রাখেন, তা খুলে গিয়ে সবাই যে তাঁর যথার্থ পরিচয় এবার পেল এতে আমি খুশি। সকলেই বেশ দু'কথা তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছে, ফলে 'লক্-আপ'-এর পর থেকেই ও-ব্যারাক একেবারে নিস্তব্ধ। এত ভালো

আবার সইলে হয়। ভয় হচ্ছে যে এই সৌভাগ্য বেশি দিন থাকবে না। কাল সকালেই আবার তিনি যথারীতি শ্লোক মন্ত্রতন্ত্র আবৃত্তি শুরু করবেন।

২৪শে অক্টোবর ১৯৪২

আজ রিতার ত্রয়োদশ জন্মদিন। এই নিয়ে তিনবার আমি তার জন্মদিনে কাছে থাকতে পারলাম না। প্রথম সেই ১৯৩৩ সালে তার তৃতীয় জন্মদিনে সে তখন পুণায়, আমি লক্ষ্ণৌর সেণ্ট্রাল জেলে। তার পর ১৯৩৮ সালে, আমি ছিলাম লণ্ডনে। তার পর আজ আমরা একই শহরে আছি, তবু পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে।

বিচারে আজ সেই প্রাচীন মহিলা ও কলাবতীর তিন মাস করে জেল হয়েছে।

২৫শে অক্টোবর ১৯৪২

জেলে স্বামী-স্ত্রী দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি যে দরখাস্ত করেছিলাম, সুপারিনটেনডেণ্ট এখনো তার

কোনো উত্তর দেননি। গতবারে সাক্ষাতের পর একপক্ষ কাল কেটে গেছে। আর একবার দেখা করবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। জেলের সব চেয়ে বড় দুঃখের বোঝা হল এই যে, এমন সব লোকের সঙ্গে থাকতে হয় যাদের সঙ্গে কথা বলাও যায় না…'কারণ ভালোবাসা না থাকলে জনতা হলেই সঙ্গী পাওয়া যায় না, মানুষের মুখ ছবির প্রদর্শনী হয় মাত্র, কথা শুধু নিরর্থক খঞ্জনীর ধ্বনি।' 'ভালোবাসা' কথাটার জায়গায় আমি শুধু সহানুভূতি কথাটা বসাতে চাই। বেকনের ওই কথাগুলির দাম গত কয়েক হপ্তায় আমি খুব ভালো করেই বুঝেচি। যার সঙ্গে কথা বলা যায় এবং যে বোঝে এমন লোকের অভাব বড় বেশি বোধ করছি। যত কম সময়ের জন্যেই হোক রঞ্জিতের সঙ্গে একবার দেখা করতে পেলে আমার ভালো হতো। কিন্তু আমাদের কর্তৃ-পক্ষের তার জন্যে তো আর তাড়া নেই!

২৬শে অক্টোবর ১৯৪২

প্যারেড। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করবার কথা জিজ্ঞাসা করায় সুপারিনটেনডেণ্ট যথারীতি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তিনি জানালেন, "পালা করে আপনাকে ও লেখাকে চোদ্দ দিনে একবার করে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হবে।" যাই হোক তবু মন্দের ভালো।

২৯শে অক্টোবর ১৯৪২

খোঁজ নিয়ে জানলাম দেখা করার ব্যাপারটা সুপারিনটেনডেণ্ট আবার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পেশ করেছেন। এই ভাবেই এখানের সব কিছুই একবার এগোয়—একবার পেছোয়। কখন যে কোথায় আছি জানবার উপায় নেই।

যথারীতি সবই চলেছে।

৩০শে অক্টোবর ১৯৪২

লেখার শরীর এখন ভালো যাচ্ছে, মনটাও ভালো। যদিও সেই ফোড়াগুলো এখনো শক্ত হয়ে আছে।

জানকী আজ ডিষ্ট্রিক্ট জেলে গেছে, সেখানেই তার মামলার শুনানী হচ্ছে। কাল পর্যন্ত মামলা চলবে। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত ব্যারাকের ওপরে অনবরত সব উড়োজাহাজ চক্কোর দিয়েছে। শেষ দল সারি বেঁধে আসে, দেখবার জন্যে আমি উঠে পড়েছিলাম। মনে হল সব শুদ্ধ পাঁচটা হবে। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে ভালো করে বোঝা যায় না। কে জানে এ-সব গতিবিধির মানে কি! সম্প্রতি চট্টগ্রামে যে বোমা বর্ষণ হয়েছে তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ভাবছি।

৩১শে অক্টোবর ১৯৪২

আজ সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ যখন চা খাচ্ছি, তখন মেট্রনের কাছ থেকে এই মর্মে একটা চিঠি এল যে, সাড়ে ন'টার সময় আমি ও লেখা রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করতে পাব। ইন্দিরাকেও সেই সময় ফিরোজের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে। এই দেখা হওয়ার দরুন লেখার উপকার হয়েছে। ভীড়ের মধ্যে

রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, যা যা বলব ভেবে রাখি সবই ভুলে যাই। একটু নিরিবিলি না হওয়ার দরুন মনটা খিঁচড়ে যায়।

আমাদের ক'টি ফুলের টব আছে—

আহামরি কিছুই নয়, তবু সেগুলি ফুল। শুধু ওই ক'টি ফুলের দরুন আমাদের পরিবেশ ও মেজাজের কতখানি তফাৎ যে হয়ে যায় ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ওধারে রঞ্জিতের বাগানের খুব উন্নতি হচ্ছে। তাঁর এতে বিশেষ উপকারও হয়েছে। জেলের অন্যান্য অংশের মতো তাঁর ব্যারাকও অত্যন্ত বিশ্রী, বড় বেশি ভীড়।

১লা নভেম্বর ১৯৪২

কাল রাত যখন প্রায় এগারটা-কুড়ি, সবে আলো নিভিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় বাইরের গেট ঝন-ঝন করে উঠল। শুনলাম মেট্রন বলছে যে আরেক-জন কয়েদীকে আনা হচ্ছে। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে

উঠলাম। পূর্ণিমা ও ইন্দু তো উত্তেজিত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নবাগতা আর কেউ নয়—চিন্তা মালব্য। তার মুখে অত্যন্ত উত্তেজিত সব কথাবার্তা। আমাদের জানালে যে তার একজন বন্ধুও গ্রেপ্তার হয়ে এখানে আসছে। ইতিমধ্যে তার জন্যে বিছানা পাতা হবার পর মেট্রন চলে গেল। দশমিনিট বাদেই বিমলা বর্মা নামে আর একটি মেয়েকে নিয়ে সে ফিরে এল। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এতবড় অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে আর হয়নি। আজ তারা জেলের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে, তারা অনেকেই খুনী—একথা শুনে, তারা তো ভয়ে স্তম্ভিত।

২রা নভেম্বর ১৯৪২

আজ প্যারেডের সময় সুপারিনটেনডেণ্ট আমায় বললেন যে, এক জেলে স্বামী-স্ত্রী যারা আছে, তারা সবাই চোদ্দদিনে একবার আধঘণ্টার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে পাবে।

৭ই নভেম্বর ১৯৪২

উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো কিছুই ঘটেনি। শুধু বাচ্চাদের জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে। পূর্ণিমা ব্যারাকের সকলকে লাল কাচের চুড়ি দিয়েছে। আমাদের সকলেরই বেশ বাহার হয়েছে।

৯ই নভেম্বর ১৯৪২

কাল সন্ধ্যায় 'লক্-আপ'-এর আগে আমরা সামান্য একটু দেওয়ালীর অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমাদের ব্যারাকে ও বাইরের দেয়ালের ওপরে কিছু আলোও দেওয়া হয়েছিল।

আমরা তৈরী হবার অগেই সুপারিনটেনডেণ্ট প্যারেডের জন্যে এসে আজ হাজির। প্রত্যেক বারই আগের চেয়ে আরও বেশি সকাল-সকাল এসে আমাদের তিনি অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলেন। ছ'জন মানুষকে যেখানে একটি কল ও একটি মাত্র পায়খানা ব্যবহার করতে হয়, সেখানে ভোর হতে না হতেই সবাইকার তৈরী হওয়া অসম্ভব। আমি বলেছি

যে ভবিষ্যতে সাড়ে-আটটার আগে প্যারেড যেন না হয়।

আজকাল আবহাওয়া বড় গোলমেলে। রাত দশটার পর থেকে সকাল সাতটা-আটটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা, তারপর বাড়তে বাড়তে দিনের বেলা বেশ গরম। এতদিন আমাদের ব্যারাকে রোদ, বৃষ্টি, হাওয়ার অবাধ গতি ছিল। এখন হঠাৎ চারদিকে মোটা মোটা পাটের পরদা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। রাতদিন সব সময়ই সেগুলো ঝোলানো থাকে।

১০ই নভেম্বর ১৯৪২

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। কতবার এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিনে ভাইয়ের কাছে আমি থাকতে পারিনি। জেলে থাকলে পুরানো কথা ভাববার খুব বেশি সময় পাওয়া যায়। গত দিন দুয়েক ধরে ছেলেবেলার ও কৈশোরের পরের সব দিনগুলির কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে আমার মনে পড়েছে—আমার জীবনের সেই দিনগুলিতে ভাইয়ের প্রভাব অত্যন্ত

বেশি। আমার জন্মের সময় ভাগ্যের কাছে যে-সব ভালো ভালো উপহার আমি পেয়েছি তার মধ্যে আমার ভাই-ই যে সব চেয়ে বড় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁকে যে জেনেছি, ভালোবেসেছি ও তাঁর এত কাছে যে থাকতে পেরেছি তাইতেই জন্ম আমার সার্থক। কয়েক দিন বাদেই তাঁর জন্ম-দিন—এ-জন্মদিনেও আবার জেলখানায় কাটবে। তাঁর জীবনের কত মূল্যবান বৎসরই নষ্ট হয়ে গেল। যা তাঁকে সইতে হয়েছে তা যখন ভাবি, তখন আমার মন দারুণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

১২ই নভেম্বর ১৯৪২

সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, যা ভেবেছিলাম দিনগুলো তার চেয়ে তাড়তাড়ি কেটে যাচ্ছে। লেখা ও ইন্দু আমার সঙ্গে আছে বলেই বোধহয় এরকম মনে হচ্ছে। তারা থাকাতে আমি খুব বেশি মনে জোর পাই। ভাই-এর খবর না পেয়ে মন বড় চঞ্চল হয়েছে। যুদ্ধ ও অন্যান্য রাজনৈতিক খবরের অভাবেও বিরক্তি ধরে।

১৮ই নভেম্বর ১৯৪২

বহু দিন লেখবার কোনোরকম ইচ্ছা হয়নি। মন মেজাজের ওপর সব কিছু কেন যে নির্ভর করে বুঝতে পারি না। চারধারে আর সবাইকে তো দেখি বেশ শান্ত ভাবে জীবনে যা আসছে তা স্বীকার করে নিচ্ছে। যা চায় তা যখন ঘটে না তখন নিজেদের মন্দ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ভবিতব্যের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আমার বেলায় তা নয়। আমার ভেতর কোথায় বোধহয় একটা আগ্নেয়গিরি আছে। সব সময়ই সেটা থেকে যেন আগুন ছিটকে বেরুতে চায়; যখন-তখন বেরিয়েও পড়ে—অগ্ন্যুৎগারটা বারে কিছু কম হলেই ভালো ছিল। আমার অবস্থা ও পরিবেশের বিরুদ্ধে আমার মনে বিরক্তি জমা হয়ে ওঠে, জেলখানায় থাকতে হলে যে-সব অসংখ্য দুঃখ, অসুবিধা ভোগ করতে হয় সেগুলো সম্বন্ধে নিরুপায় হওয়ার দরুন আমি উত্যক্ত হয়ে উঠি। এখানকার চালচলনে আমি কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারিনি। অথচ যা হয় হোক বলে সব

কিছুই মেনে নেবার জন্যে মনটা নির্বিকারও করতে পারি না।

চোদ্দই তারিখে রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি খুব উৎসুক ছিলাম। সেদিন ভাইয়ের জন্মদিন এবং সবশুদ্ধ জড়িয়ে আমার মনটা বেশ ভালোই ছিল। সকাল ন'টায় দেখা হবার কথা কিন্তু জেলের কর্মচারীদের অভ্যস্ত ঢিলেমির দরুন রঞ্জিতকে পৌনে ন'টায় এ-খবর দেওয়া হয়। তিনি তাই খবর পাঠান যে দশটার আগে তিনি আপিসে আসতে পারবেন না। সওয়া ন'টা নাগাদ একটা উড়ো খবর পেলাম যে রিতা আমার সঙ্গে একটু কথা বলবার আশায় জেলে এসেছে। বাড়িতে কি নাকি একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে, সে তাই জন্যে আমার পরামর্শ চায়। ভেবেছিলাম বাইরের দরজায় তাকে একবার দেখতে পাব। তখন কল্পনাই করতে পারিনি যে এর জন্যেও বিশেষ অনুমতির দরকার হবে। আপিসে গিয়ে, রিতার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে কিনা, সুপারিনটেনডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করলাম। জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোনে সে কথা জানান হল এবং সরাসরি উত্তর এল—'না'। নিজেকে আর আমি সামলাতে পারলাম না। রিতাকে দেখবার ও এক মুহূর্তকাল তাকে বুকে নেওয়ার জন্যে তখন আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে। বেচারা কাতর ভাবে এতদূর এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে, ভাবতে আমার এত খারাপ লাগছিল যে রঞ্জিত সেই মুহূর্তে সেখানে এসে না পড়লে আমি বোধহয় ভেঙ্গেই পড়তাম। অত্যন্ত খুশি মনে উৎসাহদীপ্ত মুখে রঞ্জিত প্রথম ঘরে ঢুকেই বললেন, "কি, ব্যাপার কি? বাড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর নাকি?" তিনি এসে আমার গায়ে হাত রাখতেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। যাই হোক মিনিট কয়েকের ভেতর নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তাঁকে সব কথা বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠে বললেন, "তুমি কি সত্যি সত্যি রিতাকে দেখবার জন্যে অনুমতি চেয়েছ? বার বার আমি তোমায় বলিনি যে আমাদের ওপর যে সব হেঁজিপেঁজিদের কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয়েছে তাদের

কাছে আমরা কোনো অনুগ্রহ চাইতে পারি না। কোনো কিছুতেই দুর্বল হয়ে পড়ো না। কারুর কাছে কোনো অনুগ্রহ চাইতে হবে এত ছোট তুমি নও, তার চেয়ে তুমি অনেক বড়। আমাদের এই সংগ্রামে কোনো দুর্বলতা বা অনুগ্রহ ভিক্ষার স্থান নেই। নিজেকে শক্ত কর।" আরও অনেক কিছুই তিনি বললেন যা এখানে লেখার প্রয়োজন নেই। আপিস থেকে যেতে-আসতে অনেক কর্মচারী তা শুনে গেল এবং শুনে মনে মনে খুশিই হল। যেখানে আশাই করা যায় না এমন জায়গাতেও আমাদের সাধনা সম্বন্ধে কতখানি সহানুভূতি যে আছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, এবারকার সাক্ষাৎ তেমনটি হল না। সাময়িক দুর্বলতাটুকুর জন্যে আমি তখন লজ্জিত ও চঞ্চল। আমার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করলেও রঞ্জিত মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন।

১৯শে নভেম্বর ১৯৪২

স্বামীর অস্ত্রোপচারের জন্যে মেট্রন শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত জেলে ছিল না। মিসেস বোথাজু যথারীতি তাই মাতব্বরী করে বেড়িয়েছে। এই স্ত্রীলোকটি সত্যিই একটি কালনাগিনী, রাজনৈতিক কয়েদীদের কাছে যখন কিছু আদায় করবার দরকার হয়, তখন সে বুকে হাঁটে, আবার তারপরই মেট্রনের সুনজরে পড়বার জন্যে আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যে করে সব লাগায়। তবে ধমকে তার ওপর জুলুম করলে সে পায়ে এসে পড়ে, কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করলে সে মাথায় চড়ে বসতে চায়। বাইরের সঙ্গে ভেতরের হুবহু মিল হওয়ার দৃষ্টান্ত আমি এই একটি মানুষের ভেতরেই দেখেছি। তার মনটা তার চামড়ার রঙের মতোই মিশকালো।

মেট্রন আজ আমাদের জানিয়েছে যে রেঙ্গুন থেকে চারজন রাজনৈতিক কয়েদীর আসবার কথা। তারা আমাদের ব্যারাকেই থাকবে! ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!

২০শে নভেম্বর ১৯৪২

কাল ইন্দিরার পঞ্চবিংশতিতম জন্মদিন গেছে। ফিরোজের সঙ্গে চোদ্দদিন অন্তর সে যে দেখা করতে পায়, কাল তারই দিন ছিল। আপিস থেকে খুব হাসিখুশি মুখে সে ফিরে এল। বিকেলবেলা পূর্ণিমা ব্যারাকে তার নিজের দিকে আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিল। বেশ আনন্দে আমাদের সময় কেটেছে। রেওয়ার মহিলারা এখনো দেখা দেননি—যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন।

আজ হঠাৎ শুনলাম আই. জি. নতুন একজন মেট্রন নিয়োগ করার দরুন পুরানো মেট্রন আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। নতুন যিনি আসছেন তিনি এখানকার একজন লেডী-ডাক্তার। সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে, বিশেষ করে মেট্রনের মনে বড় বেশি লেগেছে, কারণ সে এই কাজের জন্যে দরখাস্ত করেছিল—সে দরখাস্ত অত্যন্ত অন্যায়ভাবে নামঞ্জুর করা হয়েছে।

রেওয়ার মহিলারা কাল বিকেলে এসে হাজির। তাঁরা চারজন, সঙ্গে দু'বছর ও সাতবছরের দুটি মেয়ে। কোনো বিছানাপত্র না নিয়ে লরি করে তাঁরা এলেন। তাঁদের কাছে শুনলাম রেওয়ার জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের তৈরি হবার সময়ই দেয়নি, তাই সব কিছুই তাঁদের ফেলে আসতে হয়েছে। যে-সব অসুবিধে তাঁদের সইতে হয়, সারাদিন তাঁরা সেই সব নিয়েই অভিযোগ করেছেন। মহিলাদের একজন পুলিশের বেশ পরিচিত—তাও রাজনৈতিক কারণে নয়। তাঁর সঙ্গীরা তাই তাঁকে মোটেই পছন্দ করে না—কিন্তু এখানে আর একটা রহস্য আছে! ও-ব্যারাক থেকে মহাদেবী ও রামকালী আমার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে, কাল থেকে আমারই রান্নাঘরে তারা রাঁধবে ও খাবে।

কাল সকালে এলাহাবাদের কান্তি শর্মা নামে একটি বি. এ. ছাত্রী এসেছে। আটটার সময় তাকে হোস্টেলে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু দিনের আলো না

হওয়া পর্যন্ত সে হোস্টেল ছাড়তে রাজী হয়নি। বেশ চটপটে বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।

মেয়েরা ব্যারাকে আমাদের দিকটা সাজাতে ব্যস্ত ছিল। এক-একটা অংশের এক-একটা নাম হয়েছে। ইন্দু তার নিজেরটার নাম দিয়েছে 'শিম্বোরাজো।' আমি আগে যেখানটায় থাকতাম, লেখা এখন সে জায়গাটা দখল করেছে। সেখান থেকে বাইরের বড় দরজাটা দেখা যায় বলে সে তার নাম দিয়েছে 'বিয়্যাঁ ভেনু' (সুন্দর দৃশ্য)। আমার জায়গার নাম আমি বাধ্য হয়ে দিয়েছি 'ওয়াল ভিউ'—কারণ বলাই বাহুল্য। মাঝখানে একটা পুরানো নীল কম্বল পাতা আছে, বহুকাল আগে এটা বাচ্চাদের ঘরে পাতা থাকত, আসবার সময় আমি বিছানাপত্রের সঙ্গে এনেছিলাম। মাঝখানের জায়গাটার আমি নাম দিয়েছি 'নীল মজলিস।' এইখানেই আমরা খাওয়া-দাওয়া, রাত্রের পড়াশোনা ইত্যাদি করি।

ইন্দু আর লেখা দুজনেই বেশ কল্পনাপ্রবণ। সন্ধ্যাটা তাই কখনো খারাপ কাটে না। খাবার বরাদ্দ থেকে

বাঁচিয়ে শিগগিরই তারা 'নীল মজলিসে' একটা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করবে ঠিক করেছে। প্রত্যহ খুব উৎসাহের সঙ্গে কি কি খাবার হবে তারই আলোচনা হয়।

জেলের বেড়ালটার ইন্দু নাম দিয়েছিল 'মেহিতাবেল।' মেহিতাবেলের চারটে ছানা হয়েছে। ইন্দু আর লেখা দুজনেই তাদের নিয়ে অস্থির। এখন থেকে আমাদের দুধের ভাগ নতুন অতিথি ও তাদের মাকেও দিতে হবে। আমার কেমন মনে হচ্ছে বেড়াল-ছানাগুলো দারুণ উপদ্রব হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু জেলের একঘেয়েমীর ভেতর এ-রকম উপদ্রবও কখনো কখনো ভালো লাগে।

মেয়েদের সব কিছুরই নাম দেওয়া একটা বাতিক: লণ্ঠন, টেবিল, বিছানা, এমন কি পড়ে গিয়ে যে তেলের শিশিটার মাথাটা ভেঙ্গে গেছে, সেটারও তারা নাম দিয়েছে। এটার নাম হল 'রূ্যপার্ট— মাথা-কাটা আর্ল।' লণ্ঠনটা হল 'ল্যুসিফার।' এত সব নাম মনে রাখতে আমার বেশ কষ্ট হয়।

কিন্তু মেয়েদের তেমন কিছুই হয় বলে মনে হয় না। এই তাদের একটা আমোদ।

'লক্-আপ'-এর পর প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো ভূমিকা নিয়ে তারা নাটক পড়ে। আমি হই শ্রোতা, বেশ মজা লাগে।

নৈনী জেলের দেয়ালগুলো উঁচু, পাহারার বন্দোবস্তও ভালো, তবু বাইরের খবর আমাদের কাছে পৌঁছয়। আজ আমি শুনলাম যে রিতা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন তাকে মেট্রনের বাড়িতে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেদিন রঞ্জিতের সঙ্গে আমার দেখা করবার দিন। আমাদের মহল থেকে, পুরুষরা জেলের যে মহলে থাকে সেই বড় বাড়িতে যাবার সময় পাছে রিতা আমায় দেখতে পায়, সেইজন্যে এই ব্যবস্থা। আচমকা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাবে, জেলের কর্তৃপক্ষ সারাক্ষণ এই ভয়ে-ভয়েই থাকে। তারা হয়তো ভেবেছিল কোনোরকম ভোজবাজিতে রিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে যাবে। যাই হোক পুরানো

শিক্ষয়িত্রী মিসেস বোথাজুকে রিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে রিতা বারান্দায় না আসতে পারে। মেয়েটা দারুণ ভয় পেয়েছিল। যখন তাকে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়, তখন সে বেশ অসুস্থ ও অস্থির হয়ে উঠেছে। খবরটা শুনে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি, যদিও কিছুতেই আজকাল আর আমি অবাক হই না। মেট্রনকে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই, সে একথা অস্বীকারই করবে।

২৮শে নভেম্বর ১৯৪২

রঞ্জিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঋতু-সংহারের অনুবাদ তিনি শেষ করেছেন। কয়েকটি শ্লোক পড়ে শোনালেন। সুন্দর অনুবাদ হয়েছে।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪২

আমাদের দেশে এত সহজে মেজাজ বিগড়ে যায় কেন? সব সময় কেউ না কেউ মুখ গোমড়া করে আছে। পাছে ছোট হয়ে যায় এই ভয়ে কেউ কেউ

আবার সারাক্ষণ সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে—এমনি আরও সব। এ-সব লোকের মুখ দেখতে দেখতে ক্লান্তই হয়ে পড়তে হয়।

মেট্রন জানতে পেরেছে যে 'ওভারসিঅর' বলে কে একজন জেল পরিদর্শন করতে আসছে। এই নিয়ে জেলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাকার এক 'ওভারসিয়ার' কেন যে জেল পরিদর্শন করবে, আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না। বরাবর আমার ধারণা ছিল যে 'ওভারসিয়ার' বলতে কুলিদের যারা শাসনে রাখে সে রকম সর্দার গোছের লোক বোঝায়। এতেই প্রমাণ যে বেঁচে থাকলে কত কিছুই না শেখা যায়।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৪২

আজ বিপদে পড়ে আমায় বুড়ো মারুতির সাহায্য নিতে হয়েছে। সে তার স্বাভাবিক ভদ্রতার সঙ্গে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আমিও তার কাছে কৃতজ্ঞ। মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের দুঃখ সে সত্যিই বোঝে।

সেই বৃদ্ধা মহিলা শুধু রাগের বশে তিন দিন ধরে উপোস করে ছিলেন। কাল বিকেলে আমার সঙ্গে তাঁর বেশ একটু বচসা হয়ে গেছে। দু'চারটে স্পষ্ট কথা তাঁকে শুনিয়ে দেওয়ার পর তিনি উপবাস ভঙ্গ করেছেন। এঁকে নিয়ে সত্যিই পারা যায় না।

৮-ই ডিসেম্বর ১৯৪২

আমার কয়লা ও কাঠের দুঃখ কিছুতেই ঘোচে না। আমি যতই যোগাড় করি না কেন, আমাদের দুর্গা এমন করে সব খরচ করে ফেলে যে রাঁধবার সময় আমরা অকুল পাথারে পড়ি। সত্যিই একটা সমস্যা। আজকে কয়লা ও কাঠের অভাবে আমাদের রান্না সংক্ষেপ করতে হয়েছে। অত্যন্ত শোচনীয়! ব্যারাকের আবহাওয়া মোটেই সুবিধের নয়—ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে থার্মোমিটারের পারা যেন শূন্যেরও কয়েক ডিগ্রী নেমে গেছে। সুখের বিষয় আমার জানলার গরাদের ভেতর দিয়ে রোদ আসে সুতরাং দুনিয়ার

দিকে পেছন ফিরে আমি রোদ পোহাতে পারি! কি জীবন!

৯ই ডিসেম্বর ১৯৪২

গত পরশুদিন কমিশনার হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিলেন। গত দু'দিন ধরে সকালে দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। সুপারিনটেনডেণ্ট আজ প্যারেডের সময় আমায় বললেন যে, এলাহাবাদে আজকাল তাপের মাত্রা ৫০ ডিগ্রীতে নেমেছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান কেন যে আমার আর ভালো লাগছে না বোঝা কঠিন নয়। নোংরা হয়ে থাকাটা কেন যে আরামের মনে হচ্ছে আমি ভেবে মরছিলাম।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শুধু নৈনী জেলেই যে তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা আগে ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে এখনকার কর্তারা নিজেদের সুবিধে মতো নিয়মের ব্যাখ্যা করছিলেন। কি যে তাঁদের তাতে লাভ হয়েছে ভগবানই জানেন।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৪২

খানিক আগে রাত তখন প্রায় ন'টা—ওদিকের ব্যারাকে সেই প্রাচীনা মহিলাকে নিয়ে দারুণ এক গণ্ডগোল। শেষ পর্যন্ত তিনি লোহার গরাদের ওপর মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করে ছাড়লেন। ওয়ার্ডারনীদের মধ্যে জোহরা ও মিসেস সলমন তখন সেখানে ছিল, কিন্তু তারা এত ভয় পেয়েছিল যে কিছুই করতে পারেনি।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৪২

আজ রঞ্জিতের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথা। সময় নির্দিষ্ট ছিল দশটায়। এখন দশটা পঞ্চাশ তবু মেট্রনের দেখা নেই। আমরা যে মানুষ আর আমাদের মন বলে একটা পদার্থ আছে, একথা জেলের কর্মচারীরা কেন যে ভুলে যায় ভেবে পাই না। এ-সব কথা একটু মনে রাখলে জীবন সব দিক দিয়ে কত মধুর হয়ে উঠতে পারে।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪২

বকর্ ঈদ। আমি কুড়ে হয়ে যাচ্ছি। এ-রকম ক'টা লাইন লিখতে যেন কষ্ট হয়। শেষ যে দিন ডায়রী লিখেছিলাম তার পর থেকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সেই প্রাচীনা মহিলা সাধারণ কয়েদীদের মহলে চলে গেছেন, সেখানে থাকাই তিনি পছন্দ করেন। আমরা খানিকটা নিষ্কৃতি পেয়েছি এ-কথা সত্যি। সামান্য যে দু'চারটে সুবিধে এখানে পেতেন, তা থেকেও ওখানে বঞ্চিত হবেন জেনে আমি সত্যি তাঁর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ও-ধরনের লোককে নিয়ে কি-ই বা করা যায়। কাল সকালে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে রামকালী ও মহাদেবীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কান্তি বিকেলে মুক্তি পায়।

আজ মেট্রনের জন্মদিন ছিল।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৪২

উল্লেখযোগ্য নতুন কিছুই নেই। বাঁধা-ধরা রাস্তায় জীবন ঘুরে চলেছে। মাথাধরাটা যে আমার নিত্য-

নৈমিত্তিক হয়ে উঠছে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪২

আমার কুড়েমি ক্রমশঃ আরও বাড়ছে। গত শনিবার রঞ্জিতের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁর কাছে শুনলাম যে লেখার বিরুদ্ধে দোষের কিছু পাওয়া যায়নি বলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে এ-রকম একটা গুজব উঠেছে। এ-রকম কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে তারা ও রিতার কথা ভেবে এ-গুজব সত্যি হলে আমি খুশি হতাম। লেখা বাড়িতে থাকলে তাদের অনেক সুবিধা হয়।

মেয়েরা আজ 'লক্-আপে'র পর 'নীল মজলিস'-এ পূর্ণিমাকে আজ নিমন্ত্রণ করেছিল। অনেকদিন ধরে তাদের বরাদ্দের পয়সা বাঁচিয়ে তারা এই ভোজের আয়োজন করেছে। দুঃখের বিষয় অনেক বার ধুয়ে ধুয়ে আমাদের টেবিল ক্লথগুলো পাংশুটে হয়ে গেছে। খাবার বাসন-কোসনের দিক দিয়েও জন পিছু একটি

করে প্লেট ও কাঁটা আমাদের সম্বল। একটি মাত্র ছুরি আমাদের আছে। সবাই তাই দিয়ে কাজ চালাই। যাই হোক এ-সব অসুবিধা সত্বেও আমাদের ভোজের আয়োজন বেশ ভালোই হয়েছিল। সাধারণতঃ যা খাই তা থেকে একটু মুখ বদলানও গেছে।

তেইশ তারিখ থেকে কোলকাতায় ক'বার বিমান আক্রমণ হয়ে গেছে, দু'একটা গুরুতর। কয়েকদিন আগে মিস উইলিয়ামস বলে একজন মহিলা একরাশ গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও প্যান্সি ফুল নিয়ে জেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। যেমন তিনি রসিক মনটাও তেমনি ভালো।

গতকাল দু'মাসের মেয়াদ শেষ হতে চিন্তা মালব্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরানো বছর আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত বছর এই দিনে লেখা ও তারাকে নিয়ে আমি কোকনদে ছিলাম। রিতা রঞ্জিতের সঙ্গে বম্বেতে ছুটি কাটাচ্ছিল। তার আগের বছর এই ব্যারাকেই জানালার গরাদের ধারে বসে, রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে আমি

নতুন বছরকে অভ্যর্থনা করেছি। বছরগুলো কি তাড়াতাড়ি কেটে যায়, আর কি করুণ স্মৃতিই না পেছনে পড়ে থাকে। ১৯৪৩ সালে আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা কে জানে। আরও দুঃখ ও বেদনা, না আমাদের কামনার স্বর্গের একটু আভাস! যাই ভাগ্যে থাক সম্মান ও সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্মুখীন যেন হতে পারি এই প্রার্থনাই আমি করছি। আনন্দ-ভবনে একা একা যে-দুটি ছোট মেয়ে রয়েছে, তাদের কাছেই আমার মন অনবরত ছুটে যাচ্ছে। তবে এটুকু বিশ্বাস আছে যে নিজেদের মর্যাদা রেখে তারা চলবে। একথা জেনেই অনেকখানি বল পাই।

নববর্ষের প্রথম দিন, ১৯৪৩

"বন্ধু আমাদের নেই প্রিয়াও নয়
সম্পদ ও সুখের বাসা আমরা জানি না
শুধু পথের আর এক প্রান্তে ভগবানের যে নগর
তারই আশায় আমরা যাত্রা করেছি।

শান্তি সুখ ও আরাম তো আমাদের জন্যে নয়,
কারণ যে নগর কোনোদিন খুঁজে পাবো না
তারই সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি।
গুপ্ত যে নগর কোনোদিন চোখে দেখবার নয়
তাই আবিষ্কার করতে, আমাদের মতো যারা
বেরিয়েছে
পৃথিবীতে কোনো সান্ত্বনা তারা পাবে না।
আমাদের শুধু পথ আর উষালোক
আর রোদ ঝড় ও বৃষ্টি ;
তারকাময় আকাশের তলায় পাহারা জাগার
আগুন
আর ঘুম আর আবার সেই অন্তহীন চলা।"

আজ আমাদের জানান হল যে ভারত সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে নিজেদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখির অনুমতি দিয়েছেন। মিসেস পণ্ডিত ও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা এ-রকম কোনো চিঠি এলে তাঁদের বিলি

করা হবে। তাঁরাও নিয়মকানুন অনুযায়ী সে-চিঠির উত্তর দিতে পারবেন।

বাড়ির ও পরস্পরের সঙ্গে যাদের ছ'মাস ধরে কোনো যোগ নেই এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলে পরিবারের কোনো রকম খবরাখবর না পেয়ে যাঁরা দিন কাটিয়েছেন এমন দুজন লোক পরস্পরের কাছে পারিবারিক কি বিষয় নিয়ে চিঠি লিখতে পারেন আমি বুঝতে পারছি না। তবে প্রশ্ন করবার অধিকার অবশ্য আমাদের নেই।

মাঝে মাঝে কয়েদীদের বাচ্চাদের আমরা খেতে দিই তারা এই ব্যাপারের আশায় আশায় থাকে এবং স্নান করে পরিষ্কার হয়ে আমাদের কাছে আসে। আমি ব্যারাকের সামনে একটা ছোট তাঁবু খাটিয়ে সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা করেছি। বাচ্চারা এসে আমার রান্না দেখে, চাল ধোয়া কুটনো পরিষ্কার করা ইত্যাদিতে সাহায্যও করে। তাদের খাওয়ার আনন্দ দেখতে সত্যি বড় ভালো লাগে। অত্যন্ত ভদ্র তাদের স্বভাব যাবার আগে সবাই 'নমস্তে' বলে যায়।

মনে হয় এই সমস্ত হতভাগ্য শিশুদের ভালো করবার যদি কোনো সুব্যবস্থা থাকত! তারা মানুষ হবার সুযোগই পায় না।

আমাদের ফুলগাছগুলো বেড়ে উঠছে। মর্নিংগ্লোরী বেশ লতিয়ে উঠেছে। কয়েকটা গাঢ় নীল ও বেগুনী ফুলও দেখা যাচ্ছে। আমাদের কিছু প্যানসি ও ন্যাস্টার্শিয়াম আছে। আর আছে এক সারি কস্‌মস্‌। দেয়ালের ধারে ধারে সেগুলিকে ভারি সুন্দর দেখায়। লার্কস্পার ও অন্যান্য কয়েক জাতের ফুল ইন্দু ও লেখার যত্ন সত্ত্বেও ভালোভাবে বাড়ল না। কিছুদিন আগে মেট্রনকে কিছু তরিতরকারি লাগাতে আমরা রাজী করিয়েছিলাম। টমাটো, লঙ্কা ও ধনে-পাতা বেশ ভালোই হয়েছে। কাল দশ-বারটা বেশ ভালো টমাটো তুলেছিলাম।

লেখা ও আমি দুজনে এক সঙ্গে যথেষ্ট পড়াশোনা করি। আজকাল আমরা প্লেটো পড়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি। লেখা তো প্লেটোর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বাস করছে। বেশ কিছু হিন্দি ও কিছু সংস্কৃতও আমরা

পড়ি। বহু দিনের মধ্যে এই আমরা প্রথম এক সঙ্গে মিলে কাজ করছি। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, পরস্পরের কাছে আসবার জন্যে আমাদের জেলে আসতে হল। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই ঘটে।

আমি সিনক্লেয়ারের 'ড্রাগনস টিথ' পড়ছিলাম। ১৯৩৮ সালে যখন ইউরোপে গিয়েছিলাম, তখন যে-সব গল্প শুনেছি, এটা পড়তে পড়তে সেগুলো মনে পড়ছিল। এই বইয়ে যে-সব অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তখন আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব অনেকটা সেই রকম অবস্থায় পড়েছিলেন। পৃথিবী যেন আজকাল অনেক ছোট হয়ে গেছে, আর শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ সেখানে আছে—যারা কোনো আদর্শের জন্য নির্যাতন ভোগ করে আর যারা নির্যাতন করে। আজ এই তথাকথিত সভ্যতার যুগেও মানুষ যে পরস্পরকে গভীর দুঃখ-আঘাত না দিয়ে ভেদাভেদের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না, এটা সত্যিই বড় দুঃখের কথা। জেলে এ-সব কথা বড় বেশি করে লাগে।

কারণ এখানে মনের তারগুলো অত্যন্ত টান করে বাঁধা থাকে, সব সময়ই নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়। সাধারণতঃ বার বার এমনি ভাবে জেলে এলে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যায়. এই ধরনের অভিজ্ঞতায় মনের ওপর গভীর আঘাতের ক্ষত রেখে যায়। কারাগারের চাপেও যাঁরা ভেঙ্গে পড়েন না, এ-রকম ভাগ্যবান খুব কমই আছেন। তাঁদের স্বপ্ন ও মুক্তি-পিপাসার তীব্রতাই কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল ব্যর্থ করে দেয়। শারীরিক কোনো বন্ধন তাঁদের সত্যকার স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না।

আদর্শের জন্যে যারা সংগ্রাম করে আর যারা সত্য সৌন্দর্য ও মানুষের মর্যাদাকে পদদলিত করে সভ্যতাকে একটা বীভৎস পরিহাস করে তোলে, এই দুই শ্রেণীর লোকের জগতের মাঝখানে যারা থাকে তাদের আমি বুঝতেও পারি না, ক্ষমাও করি না। এই ধরনের লোকের সংখ্যাই যেন বাড়ছে। তাদের নিজেদের দেশের দুর্দশা বা পৃথিবীর এই নিদারুণ সংগ্রাম কিছুতেই যেন তাদের কিছু আসে যায় না…

"ধূলির সঙ্গে ধূলি হয়ে যারা মাটিতে মিশিয়ে আছে
তাদের জন্যে দুঃখ কোরো না।
সবাইকেই মরতে হবে।
শীতল স্নেহার্দ্র মৃত্তিকা জননীর মতো
সমস্ত মৃতকে ধারণ করেন।
ইস্পাত বেষ্টিত শবাধারের মতো কারাকক্ষে
যাদের জীবন্ত সমাধি হয়েছে,
সেই সমস্ত বন্দী বন্ধুদের জন্যেও
দুঃখ কোরো না।
শুধু দুঃখ কর তাদের জন্যে
যারা ভীরু, দুর্বল ও নির্বিকার।
পৃথিবীর বেদনা ও অন্যায় যারা দেখতে পায়
তবু প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।"

একটা গুজব শুনে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাপু নাকি আবার উপবাস করবেন। সঠিক খবর যদি পাওয়া যেত।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩

রঞ্জিতের সঙ্গে আজ লেখার ও আমার পাক্ষিক সাক্ষাতের দিন ছিল। আপিসে শুনলাম যে বাপু কাল থেকে উপবাস শুরু করবেন। রঞ্জিত বললেন যে তাঁদের জেলের সবাই এই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা উপবাস করবেন ঠিক করেছেন। তাঁরা সুপারিনটেনডেণ্টকে তাঁদের সঙ্কল্প জানিয়ে ও কোনো রেশন পাঠাতে নিষেধ করে চিঠি দিচ্ছেন। সবাই অত্যন্ত কাতর হয়ে আছেন।

রঞ্জিতের কাছ থেকে ফিরে এসে অবস্থাটা আলোচনা করে আমরাও পুরুষদের মতো ২৪ ঘণ্টা উপবাস করব ঠিক করলাম। ওদের মতো করে আমিও সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে চিঠি লিখেছি, সবাই তাতে সই করেছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩

আজ নিয়ে বাপু পাঁচ দিন উপবাস করছেন। অত্যন্ত কড়া পাহারা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থার খবর আমরা

সংগ্রহ করি। যেমন ঠিক করেছিলাম প্রথম দিন সেই মতো আমরা উপবাস করেছিলাম। সন্ধ্যাবেলা 'লক্-আপ'-এর আগে আমরা সবাই মিলে কয়েক মিনিট প্রার্থনা করেছি। আমাদের সকলের পক্ষেই এখন অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা ও উদ্বেগের সময়।

১৭ই মার্চ ১৯৪৩

অনেক দিন ধরে একেবারেই লিখতে পারিনি। অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে দিন কেটেছে, আমাদের মেজাজ সম্পূর্ণ ঠিক ছিল না। যাক ভগবানের দয়ায় বাপুর উপবাস শেষ হয়েছে। তিনি বেঁচে আছেন এবং ক্রমশঃ সুস্থ হচ্ছেন। যেন এই ব্যাপারে খুশি হওয়ার দরুনই কয়েকটা গাছে ফুল ধরতে শুরু করেছে। দু'এক হপ্তার মধ্যেই ফুলে চারদিক ভরে যাবে। আমাদের খুশি করে তোলবার জন্যে আরও কিছু রঙ সত্যিই দরকার। গত কয়েক দিন সত্যি বড় দুর্ভাবনা গেছে। বাড়িতে মেয়েদের জন্যে যে চীনা গভর্নেস আছে সে বিশেষ কাজের নয় বোঝা যাচ্ছে।

অনেক সমস্যাই এমন দেখা দিচ্ছে, যা সে সামলাতে পারেনা। এই রকম সময় সন্তানদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আর দেশসেবা—আমাদের বেলায় যার মানে সুদীর্ঘ কারাবাস—এই দুইয়ের মাঝে আমি গভীর দ্বিধায় পড়ি।

আমি বাড়িছাড়া হলেই কোন শূণ্য থেকে যেন সব বিপদ গজিয়ে ওঠে। আমি বাড়িতে থাকলেই সব কিছু মসৃন ভাবে চলে। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার।

২১শে মার্চ ১৯৪৩

শুনলাম যে আমি কয়েকদিনের জন্যে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি। আজ সকালেই যাচ্ছি। ইন্দু ও লেখাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবে উপায় নেই। আমি চলে গেলে তাদের নিজেদের রাঁধতে হবে। এ-শিক্ষায় তাদের ভালোই হবে।

২০শে এপ্রিল ১৯৪৩

৩০ দিন বাদে আমি আবার জেলে ফিরে এসেছি। আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখনই লেখা ছাড়া পায়। ওয়েলেস্‌লি কলেজে তার যাওয়ার বিষয়ে

আমরা তখনই আলোচনা করি। লেখা ভারতবর্ষ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না তাই এ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য তর্ক করেছে। কিন্তু রঞ্জিত ও আমি বরাবরই চেয়েছি যে স্বাধীন দেশের শিক্ষায় মেয়েদের মনের প্রসার বাড়ুক। তাই আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমেরিকার কলেজে পড়লে, এবং যারা সত্যিকার কাজ করছে এমন সব লোকের সংশ্রবে এলে, কয়েক বছর বাদে ভারতের সেবা করবার আরও উপযুক্ত হবে। আঠারো বছর বয়সের অধৈর্য দমন করা কঠিন, তবু শেষ পর্যন্ত সে রাজী হল। পরে তারাকেও তার সঙ্গে পাঠাব ঠিক করলাম। রঞ্জিত সর্বান্তঃকরণে আমার প্রস্তাবে সায় দেওয়ায় কাল আমি আমেরিকায় ভর্তির ব্যবস্থা করবার জন্য বন্ধুদের টেলিগ্রাম করেছি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওয়েলেস্‌লি কলেজের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে জবাব এল, 'ওয়েলেস্‌লি কলেজ আপনার মেয়েদের সগর্বে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে'—এতে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। 'পাসপোর্ট', 'ভিসা' ডলার

বিনিময় প্রভৃতি ব্যাপারে আমায় বিস্তর লেখালেখি করতে হয়েছে, বাড়িঘর চাকরবাকরের ব্যাপারে দৃষ্টি দেবার সময়ই পাইনি।

কাল মেয়েদের বম্বে রওনা করে দিয়ে সোজা স্টেশন থেকে নৈনী চলে এসেছি। বিদায়ের সময় খুব কষ্ট হয়েছে, চোখের জল পড়-পড় হলেও আমরা কিছুতেই ধরা না দিয়ে নানা বিষয়ে কথা বলে গেছি। ট্রেন যখন ছাড়ল মেয়েরা তখন হাত নেড়ে আমায় বলে গেল, "যেখানেই থাকি নিশান আমরা তুলেই রাখব। কিছু ভেবো না—বাবার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের ভালোবাসা জানিও।"

আমি জানি ওদের আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে আমরা ঠিক কাজই করেছি। তাদের মানসিক বিকাশের বিস্তৃত সুযোগ সেখানে আছে, খুব যত্নেও তারা থাকবে—তবু—তবু—আমেরিকা এত অনেক দূর।

আমরা এখন নিজেদের খরচায় খবরের কাগজ কিনতে পারি।

২১শে এপ্রিল ১৯৪৩

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক সহজেই আবার এ-জায়গার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম। কয়েক ঘণ্টা বাদে মনে হল যেন আমার নিজস্ব জায়গাতেই ফিরে এসেছি। বাইরের জগত কিরকম অচেনা হয়ে গেছে, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। যে ক'দিন বাইরে ছিলাম সে ক'দিন আমার মনে হয়েছে, আমি যেন 'রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল'-এর মতো বহুযুগ বাদে এককালের পরিচিত জগতে ফিরে এসে কিছুই চিনতে পারছি না। আবহাওয়াটা অন্যরকম, মানুষও বদলে গেছে। বন্ধুবান্ধব সবাই জেলে— যেদিকে তাকাই মন তিক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। সারাক্ষণই একটা উদ্বেগের মধ্যে বাস করেছি। এখানে ফিরে এসে আমি আবার যেন স্বজাতির সঙ্গে মিলতে পেরেছি। জীবন এখানে সীমাবদ্ধ বটে কিন্তু মনের যে-প্রসার, যে-উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা অর্জন করেছি, তার তুলনায়, বাহ্যিক স্বাধীনতার মূল্য আমাদের অনেকের কাছেই এমন কিছু নয়। সরকারী

নিয়মকানুন ও কারা-শৃঙ্খল আমাদের মনের সেই মুক্তি কেড়ে নিতে পারে না। একথা খুবই সত্য যে স্বাধীনতার জন্যে যারা প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছে, কারাজীবনে তাদের স্থৈর্যই সবচেয়ে অটুট থাকে। আমি ঠিক সেই দলের মানুষ বলে দাবী করতে পারিনা কিন্তু তাদের পদানুসরণের চেষ্টা অন্ততঃ করতে পারি।

কারাগার জীবনে অদ্ভুত সব পরিবর্তন আনতে পারে। আমাদের আয়ত্বের অতীত শক্তি সব সময়ই এখানে কাজ করছে। ঘৃণা ও সন্দেহময় হয়ে জীবন হঠাৎ কুৎসিত হয়ে ওঠে। আনস্ট টলার জেল থেকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে লিখেছেন। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় যেন ভারতবর্ষের জেলখানা, আর যে-ভাবে জেল কর্তৃপক্ষ সমস্ত কারা-ব্যবস্থা দূষিত করে তোলে, তার কথাই তিনি লিখেছেন।

প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের আজকাল বাইরে ঘুমোতে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দু আর পূর্ণিমা এখনো

বিমলার জন্যে ভিতরেই শোয়। বিমলা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী। আমার স্বাস্থ্য এত খারাপ যে নিজেকে এ-ভাবে আহুতি দেওয়া বোকামী মনে করে আমি বাইরেই শুচ্ছি। ঘরে আর বাইরে শোয়ায় অনেকখানি তফাৎ। ফাঁকা জায়গা, খোলা বাতাস আর সবার ওপরে আকাশের তারাগুলি মনের মাত্রাবোধ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। আর এমন একটা প্রশান্তি এনে দেয় যা আমি অন্ততঃ ব্যারাকে কোনো মতেই পাই না।

আগেকার মতোই এখনো আমার ভালো ঘুম হয় হয় না। তবে মেয়েদের জন্যে দুর্ভাবনাও তার জন্যে খানিকটা দায়ী। আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কিছু-কিছু অসুবিধা হবে, তবে নতুন মনের জোর অর্জন করে আমি শান্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি! তাই শুতে চললাম।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৩

মেয়েদের আমেরিকা পাঠানোর ব্যাপারে লেখালেখি করতে হচ্ছে তার আর শেষ নেই। ভাবছি জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যাপারটা কেমন লাগছে। তাঁর কাজ নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে, মেজাজের প্রসন্নতাও বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে কমেছে।

গত দু'দিন একটু বেশি গরম পড়েছে। রাতের প্রথম দিকটা বেশ গুমোট মনে হয়। ইন্দু বাইরে শুলে ভালো হতো। মাঝরাত্রের পর বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সকালের ঝাঁট শুরু হবার আগে উঠতে পারলে মুক্ত আকাশের তলায় শোয়ায় শরীর মন প্রফুল্ল হয়। ঝাঁট দেওয়া শুরু হয়ে গেলে আর অবশ্য প্রফুল্ল থাকা যায় না।

বাইরের উঠানে যে-কয়টা ফুলগাছ ছিল তা উপড়ে ফেলা হয়েছে। সমস্ত জায়গাটা তাই অত্যন্ত সাধারণ কুৎসিত দেখায়। সাধারণ কয়েদীদের এ-ধারে আসতেই দেওয়া হয় না। আমি নিজে এই ব্যবস্থা পছন্দ করি, এতে অনেক বেশি শান্তি পাওয়া যায়। যা-কিছু চেঁচামেচি ঝগড়া এখন ওধারেই হয়। সারাক্ষণ গোলমাল গালাগাল একেবারে অসহ্য।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৩

শুনলাম প্রথম শ্রেণীর পুরুষ কয়েদীদের বেরিলী জেলে স্থানান্তরিত করা হবে। রঞ্জিতকে সেখানে না পাঠালেই খুশি হই। ১৯৩২শে তাঁর স্বাস্থ্য সেখানে একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। জায়গাটা অত্যন্ত খারাপ এবং রঞ্জিতের এখন যা অবস্থা, তাতে সেখানে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। গরম যত বাড়ে তিনি তত দুর্বল হতে থাকেন, তাঁর শ্বাস-কষ্ট আবার দেখা দিয়েছে। তাঁর জেলখানায় থাকা আমি সহ্য করতে পারি না। আসলে তিনি খোলা জায়গার মানুষ।

২৮শে এপ্রিল ১৯৪৩

বম্বে থেকে টেলিগ্রাম এসেছে কি গোলমালের দরুন পাসপোর্টের ব্যাপারটার এখনো কিনারা হয়নি। এদিকে কয়েকদিনের মধ্যেই একটা জাহাজ ছাড়বে। টেলিগ্রামে একটা সুসংবাদ এই পেয়েছি যে আমেরিকা থেকে ভালো জবাব পাওয়া গেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার ঠিক মনোভাব যে কি তা আমি নিজেই বলতে পারি না! মেয়েরা সেখানে যাক, আমি চাই। যতদূর ভেবে দেখেছি, এতে তাদের ভালোই হবে তবু যাবার দিন যতই ঘনিয়ে আসছে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমার মন ভেঙে পড়ছে। সেই আদিকালের মেয়েদের মতোই একদিকে তাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবার ইচ্ছা আর একদিকে তাদের ভবিষ্যতের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করবার চেষ্টা এই দোটানার মধ্যে পড়ে অস্থির হয়ে উঠছি। জীবনে এত সমস্যা, এদিক ওদিক দু'দিকই যেখানে সমান দরকারী মনে হয় তার মধ্যে বোঝাপড়া করা বা একদিক বেছে নেওয়া এত কঠিন। মেয়েদের বিদেশে পাঠান সম্বন্ধে রঞ্জিত আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত জেনে মনে মনে আমি অনেক জোর পাই।

৩রা মে ১৯৪৩

আজ সকালে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো সুপারিন-টেনডেন্ট জানালেন যে রঞ্জিতকে প্রথম শ্রেণীর

অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে বেরিলী সেনট্রাল জেলে আজ স্থানান্তরিত করা হবে। কি আর আমি এতে বলব। এ-পর্যন্ত রঞ্জিত ও আমার দুজনেরই ধারণা ছিল যে রঞ্জিতকে অন্তত, মেয়েদের আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে দেওয়া হবে।

বেরিলীর কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগে। আমি ঠিক জানি রঞ্জিতের সেখানে খুব কষ্ট হবে। তাঁর ওপর বাইরের প্রভাব বড় বেশি পড়ে। তাঁর অনুভূতি বড় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। ভারতীয় রাজনীতির এই হুটোপাটি হট্টগোলের মধ্যে থাকবার যোগ্য তিনি নন। তাঁর অগাধ বিদ্যা, গভীর পাণ্ডিত্যে, শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ এবং জীবনের সূক্ষ্ম নানা সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর মনের সেই সচেতনতা, যা সাধারণের মধ্যে বিরল, এই সব নিয়ে দিনের পর দিন অজ্ঞতা ও স্থূলতার সঙ্গে এই সংসর্গে তাঁর শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে। প্রাত্যহিক এই আত্মবলি, উত্তেজনার মুহূর্তের যে-কোনো বীরত্বের চেয়ে অনেক

বেশি নিদারুণ। কিন্তু আমাদের জেলের যাঁরা কর্তা তাঁরা এই ভাবে ভাবেন না।

আশায় বুক বাঁধা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। রঞ্জিতের মনের বল খুব বেশি, শুধু তারই জোরে তাঁর শরীর মন অটুট থাকবে, বিশেষ কোনো ক্ষতি তাঁর হবে না এই ভরসাটুকুই আমার সম্বল। তিনি এখান থেকে চলে গেলে আমার সীমাবদ্ধ জীবনে বেশ একটা ফাঁক থেকে যাবে। তিনি দেয়ালের ওধারেই আছেন এটুকু জানাতে অনেকখানি সান্ত্বনা ছিল। রঞ্জিতের সঙ্গে আমার এই একাত্মতায় আমি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, অথচ দুজনে আমরা কত বছরই না আলাদা কাটিয়েছি।

৬ই মে ১৯৪৩

লক্ষ্ণৌ-এর সিভিল সার্জেনের বিধান অনুযায়ী আমি খাবার বরাদ্দ পরিবর্তন করবার জন্যে যে অনুরোধ করেছিলাম, আই. জি. তা না-মঞ্জুর করেছেন। জেলে যে-খাবার দেওয়া হয় তাঁর মতে খাদ্য হিসাবে

তার কোনো দিকে কোনো ত্রুটি নেই। তিনি আরো জানিয়েছেন যে আমাকে দৈনিক উপরি যে তিন আনা দেওয়া হয়, তা দিয়ে আমি ইচ্ছামতো জিনিস কিনতে পারি।

আমি বলেছিলাম যে জেলের সওদার বদলে আমায় যেন রোজ একটা করে পাঁউরুটি, কিছু মাখন ও কাঁচা সবজী দেওয়া হয়। সম্প্রতি আমাদের জন্যে যে-সব সবজী পাঠান হয়েছে, তা যেমন বাসি তেমনি খারাপ, আলুগুলো তো সব পচা। ওদের কৈফিয়ত হল এই যে দাম এখন অত্যন্ত চড়া, তাই সব চেয়ে সরেস জিনিস কেনা যায় না।

আই. জি. যে তিন আনার কথা উল্লেখ করেছেন আজকাল প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীদের দৈনিক বরাদ্দের ওপর তা উপরি দেওয়া হয়। কিন্তু যা কিছুরই আমরা ফরমাস দিই না কেন, জেল-কনট্রাক্টরের মারফতেই সব আসে। এখনকার চড়া বাজার-দরের চেয়েও তাঁর জিনিসের দাম অনেকগুণ বেশি তাই তিন আনায় বিশেষ কিছু সুশার হয় না। সে

পয়সা জমিয়ে হপ্তার শেষে যদি ফল কিনব ভাবি তাহলে অনেক সময়ই আমাদের শুনতে হয় যে আপিসে হিসেবের গোলমাল হয়ে গেছে, আমাদের পাওনা কত আছে তা লেখা নেই। তা না হলে কোনো আইন দেখিয়ে আমাদের জানান হয় যে সে-পয়সা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আই. জি. যতখানি মনে করেন, আমাদের উপরি তিন আনার মূল্য আসলে ততখানি নয়।

রাজবন্দীদের জন্যে এই সব নতুন নিয়ম তৈরি হয়েছে :—(১) প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীরা বাইরে শুতে পারে, তাদের ব্যারাকেও পাখা পেতে পারে। (২) আপিসে তারা টাকা জমা দিতে পারে। (৩) নিজের খরচে খবরের কাগজ পড়তে পারে। (৪) মাসে পাঁচশ কথার মধ্যে আবদ্ধ একটা চিঠি লিখতে এবং পেতে পারে। (৫) শখ করে তারা বাগান করতে পারে। প্রথম নিয়মটি ছাড়া বাকিগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর রাজবন্দীদের উপরই প্রযোজ্য। পাঁচশ কথায় নিয়মটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে

জানলে খুশি হতাম। এতে বুদ্ধির পরিচয় আছে। আমাদের নিয়তি যাদের হাতে সেই সংকীর্ণমনা কর্মচারীদেরই এটা উপযুক্ত।

রাতটা অত্যন্ত গরম কিন্তু তারায় ভরা মুক্ত আকাশের তলায় কতকটা শান্তি পাওয়া যায়। তারাগুলো চিরকাল একই ভাবে আছে—দৈনন্দিন তুচ্ছ ব্যাপারে তারা বিচলিত হয় না, জেলখানার ওপর আলো বিকীরণ করতেও তারা ভয় পায় না। আকাশের সামিয়ানার দিকে চেয়ে থাকলে মনটা জুড়িয়ে যায়—ধীরে ধীরে দিনের সমস্ত দুর্ভাবনা মনের কোন কোণে সরে যায়, ঘুম আসে…"ঘুম…হয়তো স্বপ্ন…"

১৯শে মে ১৯৪৩

প্রত্যেক দিন নিয়মিত ভাবে ডায়রী লিখব বলে আমি সঙ্কল্প করি কিন্তু রাখতে পারি না। সব কিছু মিলে আমার মনের শান্তি হরণ করেছে।

গত ৫ই তারিখে আপিস থেকে আমাদের ডেকে

পাঠিয়ে জানান হয় যে পরের দিন সকালে ইন্দু ও আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে আলমোড়ায় গিয়ে খালিতে বাস করবার জন্যে আমাদের ওপর একটা আদেশ জারি করা হয়। আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনারের খবরদারিতে নিজেদের খরচেই আমাদের থাকতে হবে। এ-সর্ত আমরা মেনে নিতে পারি না, তাই এ-প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। তারপর থেকে এ-ব্যাপারের আর কিছুই শুনিনি। সরকার যদি আমাদের ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে দিতে চায় তাহলে আমাদের ছেড়ে দিয়ে যেখানে খুশি যেতে দেওয়াই উচিত, অথবা রাজবন্দী হিসেবে আমাদের যেখানে ইচ্ছে পাঠালেই পারে। আমার সঙ্গীরা এখানে থাকতে আমি কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় যেতে চাই না।

কখনো কখনো অন্যান্য জেল থেকে অনেক দুঃসংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। অবশ্য খবরের কাগজেও তার কিছু কিছু ইঙ্গিত থাকে, যদিও কড়া খবরদারির দরুন জেলের ব্যাপার প্রকাশিত হয় না।

জেলের নিয়মকানুন এখন খুব কড়া। প্রায়ই খানা-তল্লাসী হচ্ছে। আপিস থেকে আমরা যে পেন্‌সিল পাই তার জন্য সই করতে হয়, নোট বইয়ের প্রত্যেক পাতাও নম্বর দিয়ে সই করতে হয়। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে জেল থেকে চিঠি চলাচলি হচ্ছে বলে এই সাবধানতা। এ-সব বন্ধ করতে হলে খানা-তল্লাসীতে কোনো ফল হবে না। আরও বেশি মাইনের শিক্ষিত ভালো ওয়ার্ডারনী নিয়োগ করাই সব চেয়ে বেশি দরকার। জেল থেকে চিঠি পাঠান নিতান্ত সহজ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য একথা বলছি না কারণ আমার বেয়াড়া স্বাতন্ত্র্যাভিমানের দরুনই সবাই যা করে তা আমি করতে পারি না। ট্যাণ্ডনজী আর রঞ্জিতকে অন্যান্য সবাইয়ের সঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শুনলাম ট্যাণ্ডনজীর মালপত্র নিয়ে আপিসে কিছু গোলমাল হয়েছে। তিনি নৈনীতে আখ মাড়াই করবার একটা কল এনেছিলেন, রোজ তাই দিয়ে আখের রস বার করতেন। নানারকম ফলের রস আর যা পাওয়া

যায় এমন এক-আধ টুকরো ফলই শুধু তিনি খান। সেইজন্যে এ-কলটা তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। খানিকক্ষণ খিটিমিটির পর তাঁকে সেটা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

বেরিলী সেন্ট্রাল জেলের কথা ভাবতেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। জেলটার অবস্থানই অত্যন্ত খারাপ জায়গায়। এ-প্রদেশের সব চেয়ে খারাপ জেল বলেও তার অখ্যাতি আছে। ১৯৩৩ সালে রঞ্জিত যখন সেখানে ছিলেন তখন কাছের একটা কারখানার ধোঁয়ায় জেলটা ভরে যেত বলে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছাড়া পাওয়ার পর অনেক দিন সযত্ন শুশ্রূষা করে তবে তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে গিয়েছিল। অন্যান্য যে-সব রাজবন্দীদের সেখানে পাঠান হয়েছে তাঁদের কারুর শরীরও বিশেষ মজবুত নয়। বেরিলীতে তাঁদের কিছু উপকার হবে না।

১২ই মে ১৯৪৩

রঞ্জিতের কাছ থেকে কোনো খবর নেই। অবশ্য পরস্পরের কাছে চিঠি লিখতে আমাদের দেওয়া হয় না। তবু আশা করেছিলাম কোনো রকমে কোনো খবর হয়তো এসে পৌঁছবে।

ভাইয়ের কাছ থেকে আজ একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা পৌঁছুতে কুড়ি দিন লেগেছে। তিনি লিখেছেন যে যতই ভেবে দেখছেন ততই তাঁর কাছে মেয়েদের আমেরিকা পাঠান অত্যন্ত উচিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেন যে কথাটা আগে তাঁর মাথায় আসেনি তাই তিনি ভেবে পাচ্ছেন না লিখছেন।

১৩ই মে ১৯৪৩

ইন্দু আর আমাকে আজ সকালে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কে জানে সেই সঙ্গে আমাদের ওপর কোনো আদেশ জারি করা হবে কিনা! তাহলে অবিলম্বেই আমরা আবার ফিরে আসব।

২৭শে মে ১৯৪৩

ঘটনাবহুল একটি সপ্তাহ বাইরে কাটিয়ে আবার আমি নৈনী জেলে ফিরে এসেছি! এ-যেন বাড়ি ফিরে আসার মতো। এখানকার ময়লা, গোলমাল ও একঘেয়েমী সবই যেন কোনো সুপরিচিত সহজ-বোধ্য জীবনের অঙ্গ। আমি অনায়াসেই এক মুহূর্তে নিজেকে এখানে মানিয়ে নিতে পারি এবং আমার মনে শান্তির অভাব নেই বুঝতে পেরে বেশ অবাক ও খুশি হয়েছি। ধাঁধার ছবির মতো সব টুকরোগুলো এক সঙ্গে যেন যে যার নিজের জায়গায় বসে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ চিত্র হয়ে উঠেছে। বেরিলী জেলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ শুনেও সাধারণতঃ যা হতাম ততখানি বিচলিত হইনি। আমি জানি সামান্য বাধা ও বাঁধন জয় করবার মতো মনের জোর রঞ্জিতের আছে। শুধু তাঁর স্বাস্থ্যটা বেশি খারাপ না হলেই হয়।

আমাদের ওপর আলমোড়ায় গিয়ে থাকবার যে আদেশ জারি করা হয়েছিল আমরা তা মানতে রাজী

না হওয়ায় গতকাল একজন পুলিশ কর্মচারী বাড়িতে আমায় জিজ্ঞাসা করতে আসেন যে জেলে ফিরে যাওয়ার জন্যে কখন আমি প্রস্তুত থাকব। যে-কোনো সময় আমি প্রস্তুত জানাতে তিনি বিকাল ছ'টার কথা বলেন এবং আমি রাজী হই। সুখের বিষয় ইন্দুর নামে কোনো পরোয়ানা ছিল না। জেলে ফিরে যাবার মতো অবস্থাও তার নয় কারণ সর্দি ও জ্বরে সে শয্যাগত।

বিকেল সওয়া ছ'টায় নগর-কেতোয়াল ১২৯ ধারার ডি. আই. আর. অনুসারে এক পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলেন। এঁর খ্যাতি আগেই আমাদের কাছে পৌঁছেচে। আমার মালপত্র একটা পুলিশ লরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি চললাম কোতোয়ালের নিজের গাড়িতে। তিনিই গাড়ি চালালেন, পাশে তাঁর গোয়েন্দা-বিভাগের একজন ডেপুটি। পথে যেতে যেতে, আমার ও আমার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে অনেক রকম মন্তব্য তিনি করলেন। আমার দিক থেকে কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভগ্নপ্রায় অতি

পুরাতন গাড়িটা চালাবার ব্যাপারেই বাধ্য হয়ে তাঁকে মনোযোগ দিতে হল। ভারতে বৃটিশ শাসনের তিনি একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি।

মেয়েরা ১৫ই তারিখে জাহাজে রওনা হয়ে গেছে। এতদিন তাদের চলে যাওয়ার জন্যেই যত উদ্যোগ আয়োজন করেছি। কিন্তু এখন তারা চলে গেছে বলেই আমার মন খারাপ লাগছে। তাদের নিরাপদে পৌঁছিবার খবর না-পাওয়া পর্যন্ত মনের গভীর উদ্বেগ আর কাটবে না।

মনে পড়ে ভাই জাহাজে কোথাও রওনা হবার পর মা যখন ভেবে মরতেন, তখন কত হেসেছি। এখন কিন্তু ঠিক মা'র মতোই আমার অবস্থা হয়েছে, অবশ্য এ-শতাব্দীর গোড়ার দিকের সেই শান্তিময় দিনগুলির তুলনায় এখন দুর্ভাবনার কারণ আমার অনেক বেশি। জেলের দরজায় হাসিমুখে সবাই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। কয়েদীর অভ্যর্থনা সত্যই আন্তরিক। পূর্ণিমা ও আমি রাত ন'টা পর্যন্ত বসে গল্প করলাম। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে যে যার

বিছানায় শুতে গেলাম। সে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগল আর আমি তারাগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম।

৪ঠা জুন ১৯৪৩

এইমাত্র 'লিডার' কাগজে মেলবোর্ন থেকে একটা খবরে দেখলাম আমেরিকা যাবার পথে লেখা ও তারা অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেচে। এতদিন মনটা বড় ভার হয়েছিল। মনে মনে সমস্ত পথটা আমি মেয়েদের সঙ্গে অনুসরণ করেছি।

বেরিলার খবর ভালো নয়। রঞ্জিতের কাছ থেকে যখন কোনো চিঠি আসেনি তখন হয় আমার ২৪শে তারিখের চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছয়নি, নয় আমার কাছে চিঠি লেখবার অনুমতি তিনি পাননি।

৫ই জুন ১৯৪৩

গত তিন দিন ধরে গরম বাড়তে বাড়তে আজ শেষ পর্যন্ত দারুণ ঝড় হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বড় বড় শিল পড়ে উঠানটা ঢেকে গিয়েছিল। আমাদের ব্যারাকের অনেক টালি ভেঙে গেছে, ফুলগুলোও মরে গেছে।

সমস্ত জায়গাটা হঠাৎ শাদা উজ্জ্বল একটা জাদুর দেশে রূপান্তরিত হয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, তবে উঠানে একহাঁটু জল বলে আমাদের ঘরে শুতে হবে।

বৃষ্টি-বাদলার দরুন ওয়ার্ডারনীরা তাদের কাজে ফাঁকি দেবার একটা সুবিধে পাবে। জেলের ঘড়িটা বিকল হয়ে আছে সুতরাং সমস্ত রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে কাল সকালে তালা খোলার সময় তারা "সব ঠিক হ্যায়" এই কথাই জানাবে।

গত দু'রাত্রি ধরে বহু লরির জেলের গেট পার হয়ে যাওয়ার শব্দ আমরা শুনেছি। প্রথমে কোনো খবরই পাওয়া যায়নি, তারপর ধীরে ধীরে জানতে পারলাম এগুলো মিলিটারি লরি—এই রাস্তায় কোলকাতায় চলেছে।

৭ই জুন ১৯৪৩

এক অজানা চীনা বন্ধু আমায় একটি প্যাকেট পাঠিয়েছেন। প্যাকেটটি 'ক্রিশানথিমাম'-চায়ের

বলেই মনে হচ্ছে। রঞ্জিত আর ভাই না থাকলে এ চা খেয়ে আমি আনন্দ পাব না। একা একা এমন অপরূপ জিনিস উপভোগ করা যায় না।

আজকের কাগজে একটা খবর দেখলাম যে মেয়েরা মেলবোর্ন ছাড়িয়ে গেছে।

বাঙলার খবর বড় খারাপ। মেদিনীপুরের ঝড়ে যা ক্ষতি হয়েছে তা সামলে উঠতে না উঠতে দারুণ খাদ্যাভাবের সূচনা সেখানে দেখা দিয়েছে। 'মডার্ণ রিভিয়ু'র মতে সামনে দারুণ দুঃসময়। চারদিকে কি ভয়ঙ্কর জট পাকানো বিশৃঙ্খলা। এই জট যারা ছাড়াতে পারত তারা কারাগারে বন্দী......

সমস্ত প্রদেশ থেকে রাজবন্দীদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহারের খবর আসছে। সকল প্রকার লাঞ্ছনা ও কঠোর ব্যবহারের নীতি জ্ঞাতসারেই অনুসরণ করা হচ্ছে। কংগ্রেসের মূলনীতি এতে ভুলে যেতে হয়......

নিদারুণ দুর্ঘটনা। রামকালীর ষোলো বছরের যে ছেলেটি তার কয়েক হপ্তা আগে ছাড়া পায় হঠাৎ

ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে মারা গেছে। তার বাবা নৈনীতে পুরুষদের জেলে বন্দী। যথারীতি তাঁর ছুটির জন্যে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারী লাল-ফিতে খুলতে দেরি হয়, মৃত্যুরও তর সয় না। ছাড়া পাবার আদেশ আসবার আগেই ছেলেটি মারা যায়। জেল থেকে শেষ পর্যন্ত বেরুলেও কোনো যানবাহন তিনি পাননি। তিনি যখন বাড়ি পৌঁছলেন ছেলেটির তখন সৎকার হয়ে গেছে। স্ত্রী এবং ছোট দুটি মেয়েকে রেখে তিনি ফিরে এসেছেন।

১১ই জুন ১৯৪৩

অনেক দিন ধরে বিছানা থেকে আর উঠতে পারিনি। ডাক্তারেরা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ফল কিচ্ছু হয়নি। শুনলাম স্বাস্থ্যের খাতিরে আমায় মুক্তি দেওয়া হবে।